(দেশ হিতৈষণায় আলোদয়ী গ্রন্থ।)

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন

দাসবুদ্ধির বর্জ্জন

বঙ্কিম সমালোচনা

যেপড়িবেসেইকরিবে

সীতারাম বা কাগজ-রাজ্য

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি,
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের বাতি।
তবে যদি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি হয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

মূল্য সাত আনা

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন দাসবুদ্ধির বর্জ্জন

বঙ্কিম সমালোচনা

যেপড়িবেসেইকরিবে

সীতারাম বা কাগজ-রাজ্য

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি ;
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিবেক বাতি।
তবে যদি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন করিয়ে ;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি হয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে
ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.
1922.

মূল্য সাত আনা

FEMALE FRIEND

(ফিমেল ফ্রেণ্ড।)

এই অনন্ত উপকারী মহৌষধির সেবনে ঋতুদোষ, বাধক শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রমণীরোগ সকল সমূলে নির্ম্মূলিত হয়। প্রসবের পর এই ঔষধ সেবন করিলে সেই জননীতে সূতিকাসম্ভব কোন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে না। প্রসবের পূর্ব্বে জরায়ু বা পো-নাড়ীর মুখ খুলিয়া যাইবার পর এই ঔষধ উচ্চ মাত্রায় পান করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে। প্রথমবারের প্রসূতিকে এ ঔষধে প্রসব না করানই উচিত। তবে ভাল ধাত্রীর হাতে হইলে ক্ষতি হইবে না। এই ঔষধ গৃহে গৃহে সঞ্চিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিরারোগ্য অর্থাৎ বহুকালের পুরাতন রোগ সকলের বিবরণ সহ ৫৲ টাকা ফিঃ পাঠাইলে ডাঃ হোসেন সাহেব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঔষধ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধের মূল্যও বেশী ক্রিয়াও বেশী।

হাসেম কাসেম এণ্ড কোং,
৬৩ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দরবার প্রেস

দরবার প্রেসে সকল প্রকার জবের কাজ অতি সুন্দর রূপে ও সুলভ মূল্যে ছাপা হইয়া থাকে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন। বাঙ্গালা ইংরাজী ও উর্দ্দু সকল প্রকার টাইপ প্রচুর পরিমানে মজুত আছে।

S. A. HASHEM, B. A.
63 Collin Street, Calcutta.

182. Mc. 922. 13.

বঙ্কিম সমালোচনা

সীতারাম বা কাগজ-রাজ্য

——:•:——

১ * ক্ষোভ। * ১

অন্যলোকের মান-সম্ভ্রম ও সৌভাগ্যাদি অবলোকন করিয়া এবং সে ব্যক্তি তাহা কত অত্ন-পরিশ্রমে অর্জ্জন করিয়াছেন, সে দিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, যাহারা বিনা পরিশ্রমে এবং বিনা বুদ্ধিকৌশলের চালনায়, তাঁহাদের ন্যায় মান-সম্ভ্রমে সৌভাগ্যশালী হইতে চায়; তাহারা অতি মূর্খ ও বাতুলবুদ্ধি হইলেও, বঙ্গদেশে সেরূপ ক্ষোভদষ্ট লোকের অভাব নাই। ইহারা জ্ঞান-গুণ, কল্পনা ও সাহসাদি ধৈর্য্য-বীর্য্যে নিতান্ত অপদার্থ হইলেও, প্রাণে প্রাণে রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে। শতশত বার চেষ্টা করিয়াও একমাত্র বুদ্ধির দোষে সফলকাম হইতে পারিতেছে না। ইহারা এইরূপ ক্ষোভদষ্ট হইবার কারণে এবং সত্যরাজ্য জয় করিতে একান্ত অক্ষম বলিয়া, কল্পনাতেই রাজ্য নির্ম্মাণ বা জয় করিতে থাকে এবং সেই কল্পনায়-অর্জ্জিত রাজ্যের ভোগদান করিয়া, কল্পনাকে তাজা করিয়া লয় ও সেই আনন্দে লম্ফ-ঝম্প করিতে থাকে। এইরূপ অলীক এবং কাল্পনিক কথায় বিশ্বাস করিতে করিতে, এ জাতির কল্পনাদি দূরবীক্ষণ শক্তি দুষ্কল্পনার তুচ্ছ ধূলিতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

এই জাতির মন্দ কল্পনাকে ভোগ দিবার জন্যই বঙ্কিম বাবু, সীতারাম, আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি কতিপয় ক্ষোভক্ষয়ী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। যাহার পাঠে উহাদের মাথার তুচ্ছ কল্পনা সকল এতদূর পুষ্টিলাভ করিয়াছে যে, এখন উহারা কার্য্যে নহে, কেবল কল্পনাতেই রাজ্য জয় করিয়া চলিয়াছে। এই সকল অসৎবুদ্ধির নিকট কোন সৎবুদ্ধিই স্থান পাইতেছে না। যাহারা কল্পনায় রাজ্যবিস্তার করে এবং সেই অলীক আনন্দে দিশাহারা হয়, সেইরূপ বস্তুহীন জাতির সহিত, কোন জাতির একতা হওয়া কি সম্ভব? না তাহারাই একতার কোন মর্য্যাদা বুঝিতে পারে?

আমরা সাধারণতঃ মনে করি, ছেলেরাই বুঝি ছেলেখেলা করে এবং বড় হইলে

তাহারা ছেলেখেলা ছাড়িয়া দেয় ; ইহা আমাদের ভ্রম এবং প্রবল অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। আমরা দেখি ছেলে অপেক্ষা বয়ঃপ্রাপ্তরা অধিক পরিমাণে ছেলেখেলা করিয়া থাকে, এবং বুড়াদিগকে ছেলে ভুলান করা অধিক সহজ।

ছেলেরা স্বভাবতঃ তাহাদের ক্ষুদ্র জগন্মধ্যে যাহা যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করে। শিশুরা ধূলার সংসার নির্ম্মাণ করিয়া গুরুজনেরা যে ভাবে সংসারধর্ম্ম করেন সেইরূপ করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র মনের ক্ষোভ দূরীভূত করে। পাঠশালার বালকেরা নিজেকে গুরুমহাশয় স্থির করিয়া, কঞ্চি-করে কচু-বন ঠেঙ্গাইয়া বলিতে থাকে,—'তুই কাল কামাই করিলি কেন?' বালকের ঐরূপ কল্পনা-কল্পিত কার্য্য-কলাপে আমরা হাসি, কিন্তু সে বালক হাসেও না, লজ্জাও পায় না এবং সে বুঝিতেও পারে না যে তাহার কার্য্যগুলি হাস্যোদ্দীপক। পক্ষান্তরে আমরাও দুর্বুদ্ধি বশতঃ যাহা যাহা করি, তাহার দর্শনে অন্যান্য লোক হাসিলেও আমরা হাসিও না, লজ্জাও পাই না এবং পাগলামী করিতেছি বলিয়া বুঝিতেও পারি না।

সন্তানশূন্যা রমণীগণ জন্তু পুষিয়া সন্তান-ক্ষোভ নিবারণ করিয়া থাকে। মূর্খেরা কল্পনায় পণ্ডিত সাজে, দরিদ্র-ধনী হয়, কুল-বধূরা গৃহিণী এবং থিয়েটারের দর্শকেরা এক্টার সাজিয়া মনের ক্ষোভ দূর করিয়া থাকে। এ সকল প্রক্রিয়া দুর্ব্বল বুদ্ধির পরিচায়ক হইলেও, বঙ্গদেশে ইহারই চাষ চলিতেছে। আমরা রাজ্যহারা জাতি, আমাদের যত কিছু ক্ষোভ রাজ্যের জন্য, কিন্তু আমরা দারুণ দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বহু কাল হইতে পতিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এ জাতির বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশ অধিকার করিতে মুসলমান বা ইংরাজকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। ইহা পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। দুইদশটি সাদী সৈন্য দেখিলেই ইহারা ভীত হইয়া পলায়ন করে। এদেশের ধনুর্দ্ধরেরা তেঁতুল গাছে বসিয়া তীর যুদ্ধ করে; ইহারা সম্মুখ-সমর আদৌ বোঝে না। দুষ্কল্পী কবিদলের নিন্দিত কল্পনার কীট সাজিয়া মাথাকে কণ্টকবনবৎ কীটাশ্রম করিয়া রাখিয়াছে। সুকল্পনার যে কি আকাশ-সম্ভব শক্তি, ইহারা তাহা আদৌ জানে না। যে কবি অলীক বচন-লীলায় এ জাতির কুকল্পনাকে ভোগ দিতে পারে, সেই কবিই ইহাদের ভক্তির পাত্র। ইহারা সুকল্পনা চাহেও না, বচন-বিন্যাসের সৌন্দর্য্যেই বিকাইয়া আছে। উত্তম ভাবায় বাবাকে বোনাই বলিয়া বুঝাইয়া দিলে, ইহারা তাহাই বুঝিয়া যায় এবং অন্তর হইতে বিশ্বাস করিয়া লয়। বহুকালাবধি পতিত হইয়া থাকিবার কারণে ইহারা কল্পনা-শূন্য কাকাতুয়াবৎ, ভাষা ও বচন-বিন্যাসকেই বিদ্যা বলিয়া জানে।

সাহিত্যই প্রকৃত জ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ। এ দেশের (মৃণ্ময়) প্রদীপ সম্মুখে আলো দেখায় এবং পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রাখে। এ দেশের লেখকেরা অর্থের জন্য গ্রন্থ লেখে, দেশ-হিতৈষণা বা বিদ্যা বিতরণের জন্য নহে। পাঠকদিগের নিকৃষ্ট-রুচি ও মন্দ প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়াই তাহাদের মূল মন্তব্য। ইহা প্রকৃত কেন, দুষ্ট ব্যবসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ব্যবসায়ীরা প্রদীপ জ্বালিয়া গ্রন্থ লিখিতে বসে। পরকীয় কাননজাত বস্তুগুলি ভাল হইলেও তাহা অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়া, স্বকীয় কাননের যাবতীয় মন্দ দ্রব্য আলোর সম্মুখে বসাইয়া, বাক্‌পটুতাবলে সেই বনজ ওলবৎ বস্তুগুলিকে রাজগঞ্জের বলিয়া বিক্রয় করে। ক্রেতারা সেই সকল বনজ ওল খাইতে খাইতে তাহাদের মুখ ও মাথা বনজওলবৎ বস্তুহীন হইয়া গিয়াছে। রাজগঞ্জের ওল তাহাদের মুখে পান্সা লাগে। এই কবিদের রাজ্যে রাজা নাই, কাজেই তাহারা দস্যু ও বদমাইশদিগকে রাজা ও সম্রাট বলিয়া লেখেন। রাজ্য নাই, একটা বনকে রাজ্য বলিয়া স্থির করেন। দেবতা তুল্য সজ্জন নাই, লম্পটদিগকেই চরিত্রবান্ করিয়া দেখান। দেবী প্রকৃতির রমণী নাই, কুলটাদিগকেই দেবী বলিয়া আঁকেন। লেখকদের নিকট হইতে এইরূপ বিপরীত-বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে করিতে, পাঠকেরাও বিপরীত-বুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যপথ ভুলিয়া কুপথগামী হইতে হইতে এখন সত্যপথ হইতে এতদূর দূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে, আর তাহাদের পথ পাইবার উপায় নাই। যাহাদের মাথার ভিতর কেবল জঙ্গল, তাহারা রাজধানী খুঁজিয়া পাইবে কেন? কাজেই তাহারা কল্পনাতেই রাজা, মহারাজা ও সম্রাট আদি সাজিয়া বসে। অনেক ক্ষোভদষ্ট লোক, ইংরেজ রাজার নিকট হইতে ঐ সকল রাজা-মহারাজা আদির উপাধি ক্রয় করিয়া লইয়া ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু দেখিয়া শুনিয়া কয়েকখানি ক্ষোভক্ষয়ী গ্রন্থ লিখিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইলেন।

২ ❋ কাগজ-রাজ্য। ❋ ২

'সীতারাম' একটি মস্ত ক্ষোভক্ষয়করী গ্রন্থ। লেখক হিন্দুদিগের কল্পনাকে রাজভোগ দিবার জন্য এক 'কাগজ-রাজ্য' নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে হিন্দুরাজ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাহিত্য প্রদীপের সম্মুখে দস্যুরাজ সীতারামকে বসাইয়া বঙ্গের রত্নবৎ মুর্শীদ কুলীখাঁকে প্রদীপের পশ্চাতে, অন্ধকারে বসাইয়াছেন, এবং মাকাল-ফলকে কাবুলী আপেল বলিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। সেই জন্যই বঙ্গদেশে

মাকালফলের আদর বাড়িয়াছে, আপেল যে কি, তাহা কেহ জানে না, চেনে না ও তাহার কল্পনাও করিতে পারে না। এই বায়সরুচ্য মাকালফল, সহস্রবার গলায় বাঁধিলেও, ইহা ভিন্ন আর আমাদের খাদ্যান্তর নাই।

মুর্শীদকুলীখাঁ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালেই এস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নভেল ঠাকুর সেই ন্যায়পরায়ণ নবাবকে কুৎসিত মসীর প্রহারে কলঙ্কিত করিয়া দেখাইতে গিয়া, সেই কালি নিজেই মাখিয়াছেন। নবাব মুর্শীদকুলী-খাঁয়ের শাসন সময়ে বঙ্গদেশ দস্যুময় হইয়াছিল। মুর্শীদকুলীখাঁন সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য যমদণ্ড ধারণ করিলেন। তাহাতে নভেল-ঠাকুরের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল, তিনি হিন্দুরাজ্য এবং হিন্দুদের সর্ব্বনাশ গণিলেন,—কারণ তাঁহার মতে দস্যুরাই হিন্দুদের রাজা, বনদেশই তাহাদের রাজ্য, অত্যাচারই তাহাদের রাজশক্তি। তাই তিনি মুর্শিদের দিকে তিক্ত মুখে তাকাইলেন। ঠাকুর যাহাই বলুন, নিরপেক্ষ ইংরাজী ইতিহাস কি বলিতেছে দেখুন।

Murshid Kooly Khan, also called Jaffer Khan, the ablest governor who ever ruled in Bengal was the son of a poor Brahmin, Aurengzeb made him Dewan of Bengal in 1701, * * Whenever the Hindus committed gross frauds, he obliged them and their families to become Mahomedans. * * * He was constant to one wife and never admitted any eunuch into his palace. He was careful to provide against famine and never permitted the exportation of grain. He encouraged learned men, he was exceedingly charitable to all (even to Hindus.) His habits were simple ; he indulged with no luxury, his whole sole was given up to business. Marshman.

ঠাকুরের বিবেচনায় এই মুর্শীদকুলী খাঁন দুষ্ট এবং দস্যুপতি সীতারাম শিষ্টলোক হইলেন। এই ঠাকুর এবং আরও অনেক ঠাকুর আছেন, যাঁহারা মুসলমান গৌরব ধ্বংস করিবার জন্য, মুসলমান কাননের কীট হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভয়ানক ক্ষুপণজ্ঞান হইবার কারণে এবং সুকল্পনার অত্যন্ত অভাবে, কিছুই বুঝিতেছেন না যে, তাঁহাদের লেখনীর প্রহারে মুসলমান বা অন্য কোন সম্প্রদায় শ্রীভ্রষ্ট হইবে না। এ মসী তিনি নিজেই নিজের মুখে মাখাইয়া সং সাজিতেছেন। যাহারা অলীক কল্পনার উপাসক তাহারা সারবতী কল্পনার মর্য্যাদায় প্রবেশ করিতে পারে কি ? এবং সারবতী কল্পনা কাহাকে বলে তাহাই তাহারা জানে কি ? এইরূপ দুষ্য কল্পনা

মাথায় লইয়া তাহারা যে কিছুই উন্নতি করিতে পারিবে না, সে কথা কেহ কল্পনা করিতে পারে কি ? কে কল্পনা করিতে পারে যে, যদি এই রাজ্যে হিন্দু না থাকিত তবে আজিও ইহা মুসলমানরাজ্য থাকিত ? কে কল্পনা করিতে পারে যে, যদি মুসলমানেরা এই রাজ্য জয় না করিত, তথাপি হিন্দুরা এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিত না। কে চিন্তা করিতে পারে যে, যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তিরা সকল পুষ্টিকর দ্রব্যেই আস্থাভ্রষ্ট, তেমনি মৃত্যুপ্রায় জাতিও উপদেশ সকলের উপেক্ষক। – কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব বুদ্ধিবীর সকলেই।

৩ ❋ দুষ্ট কি শিষ্ট। ❋ ৩

ইংরাজী ১৭০১ সাল হইতে ১৭২৫ সাল পর্য্যন্ত, এই বঙ্গদেশ, নবাব মুর্শীদকুলী খান কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। তিনি এক দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। স্বজাতির প্রথা সমূহের বিরুদ্ধাচারী হইয়া, তিনি কিশোর বয়সেই হাজী সুফিয়ান নামক এক মুসলমান বণিকের সহিত পারস্য যাত্রা করেন। তথায় মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া, স্পাহান নগরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, পারস্য ভাষায় এক সু পণ্ডিত হন। মুর্শীদকুলীর প্রশংসারাশি চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়িলে, সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বেরার প্রদেশে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। তাঁহার পারদর্শিতা ও অপরিসীম বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া মুগ্ধচিত্ত সম্রাট তাঁহাকে হায়দ্রাবাদের দিওয়ান করেন; সেখানে সুখ্যাতি লাভ করায়, তাঁহাকে ১৭০১ অব্দে বঙ্গদেশের দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। কথিত আছে এবং ইতিহাসেও বলে যে, মুর্শিদকুলির মত সকল গুণে বিভুষিত নবাব বঙ্গদেশে কেহ কখনও নিযুক্ত হন নাই।

বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া, মুর্শিদকুলীখাঁ, দেশের অবস্থা ভয়ানক বিশৃঙ্খল ও শোচনীয় দেখিলেন। বিশেষ করিয়া হিন্দুরা ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঢাকা অঞ্চলের হিন্দুরা, অধিক পরিমাণে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তাহাদের ঠকবাজী, দস্যুবাজী, ফেরেববাজী, রাজদ্রোহিতা, স্ত্রীহরণ, নরহত্যাদি কুট-কৌশলে এবং নিন্দিত চাল-চলনে দেশ জরজর হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা নিরীহ ভদ্র-লোকের মত গ্রামে গ্রামে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া বাসকরে; আবার গভীর রাত্রে, বনমধ্যে যাইয়া একত্র হয় এবং তথা হইতে একত্র গমন করিয়া, জেলান্তরে যাইয়া লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহারা লাঠির উপর ভর দিয়া এমন কৌশলের

সহিত পথ পর্য্যটন করিত যে, ঘণ্টায় আট দশ ক্রোশ পথ চলা তাহারা অতি তুচ্ছ মনে করিত।

যেমন সুদক্ষ চিকিৎসক রোগীর মুখ দেখিলেই রোগ নির্ণয় করিয়া লয়, বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতেই মুর্শীদকুলীখাঁ তেমনি এ দেশের রোগ ধরিয়া ফেলিলেন। দুর্দ্দান্ত দস্যুদলকে দমন করিবার জন্য তিনি পূর্ব্ববঙ্গের ভূষণা নামক নগরীতে এক পরাক্রমশালী ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। এই ফৌজদারের নাম তোরাব খাঁন। তোরাব খাঁন দস্যুদলনে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিস্তর ফকির এবং শা সাহেবদিগকে ডিটেক্‌টিভ রূপে নিযুক্ত করিলেন। এই ফকিরদের অনুসন্ধানে এবং তোরাবের কঠিন শাসনের গুণে অচিরে অবৈধ অত্যাচারীর দল প্রশমিত হইয়া গেল। দস্যুরা দস্যুতা ত্যাগ করিয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে শান্তিমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহারা বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হইয়া গেল। দলপতিরাও যে যাহার দল ছাড়িয়া দিল।

এই সময়ে সীতারাম নামে একজন, এক সুদক্ষ দস্যুদলের দলপতি ছিলেন। ইহার পিতা রাধারাম, ঐ আয়াস-সুলভ বৃত্তি দ্বারা, বিস্তর ধনসঞ্চয় ও ভূমিসম্পত্তি করিয়াছিলেন। সীতারাম কার্য্যপটু হইয়া উঠিলে, রাধারাম ঐ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে যখন দেশে তোরাব খাঁর দোহাই ফিরিতে লাগিল, জীবন্ত দস্যুদের গোর পর্য্যন্ত দেওয়া হইতে লাগিল এবং যখন দুরাচার দস্যুদলকে সবংশে মুসলমান করিবার আদেশ প্রচারিত হইল, তখন বেগতিক দেখিয়া সকলেই দল ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। সকলে দল ছাড়িয়া দিলেও সীতারাম তাহার দল ছাড়িলেন না, তখন অন্যান্য দলের নেতৃবর্গ, সীতারামের দলে আসিয়া যোগদান করিতে লাগিল; তাহাতে তাঁহার শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, একটি ক্ষুদ্র রাজশক্তিবৎ হইয়া দাঁড়াইল।

গঙ্গারামদাস নামে এক রাঢ়ী কায়স্থ এই দস্যুবৃত্তি করিত, তাহার দল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সম্প্রতি সে, সীতারামের দলে আসিয়া মিশিয়াছে। এই গঙ্গারামকে একবার এক ফকির-ডিটেকটিভ, ফৌজদারীতে ধরাইয়া দেন। সন্দেহের উপর কাজিসাহেব গঙ্গারামকে বেত্র মারিয়া ছাড়িয়া দেন। গঙ্গারাম তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য, অনুসন্ধান করিয়া ফকিরের পর্ণাবাসটী দেখিয়া রাখে। ইতিমধ্যে সীতারামের পিতা মরিয়া যায়, সেই কারণে তাঁহাকে দল ছাড়িয়া দিতে হয়। অগত্যা গঙ্গারামও বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার চিন্তা করিলেন। কিন্তু তিনি দাগীচোর বলিয়া কেহ তাঁহাকে কন্যাদান করিতে চাহিল না। এই কারণে সেই ফকিরের উপর আবার

তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। ফকিরের একটী রূপবতী কন্যা ছিল; গঙ্গারামের লালসা সেই কন্যার উপর পড়িল এবং তাহাকে অপহরণ করাই সিদ্ধান্ত করিল। এক রাত্রি গঙ্গারাম, সেই ফকিরের পর্ণাবাসে গমন করিল। দেখিল ফকির কুঁড়ের বাহিরে শয়ন করিয়া নাক ডাকাইতেছেন এবং ভিতরে সেই রূপবতী কন্যা তাঁহার মাতার পার্শ্বে, অন্ধকার কুটীর উজ্জ্বল করিয়া, নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িয়া আছেন। গঙ্গারামের হাতে এক পাঁঠাকাটা শাণিত দা ছিল, তাহার এক কোপে ফকির-পত্নীর মস্তক পৃথক করিয়া দিল; এবং অবিলম্বে সেই কন্যাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, যেমন কুটীরের বাহিরে আসিল অমনি ফকির জাগিয়া উঠিলেন। চীৎকার করিতে চৌকিদার এবং পাড়া-প্রতিবেশী সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। গঙ্গারাম ধরা পড়িল। তাহাকে তৎক্ষণাৎ ফৌজদারে সোপর্দ্দ করা হইল। প্রতি-হিংসা, নারীহত্যা এবং কন্যাহরণ এই তিন অপরাধে, পরদিবস কাজি সাহেব তাহাকে সর্ব্বজন সম্মুখে মাঠের মধ্যে, জীবন্ত গোর দিবার আদেশ করিলেন।

নভেল ঠাকুরকে চিরকালই দস্যু সাপেক্ষ দেখি, এ গ্রন্থে তিনি, গঙ্গারাম এবং সীতারাম এই দুই নরাধম পাপিষ্ঠকে সম্মান দান করিবার জন্য, নবাব মুর্শীদকুলীখাঁয়ের ফৌজদার তোরাবখাঁ এবং তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গকে, অস্বাভাবিক কল্পনায় মন্দ বলিয়াছেন। কিন্তু অর্থলোভী সাক্ষীদের মত ঠাকুরের কথা জেরায় টেকে না। তিনি বলিয়াছেন, গঙ্গারামের অজ্ঞাতসারে, এক নিদ্রিত ফকিরের গায়ে তাহার পা ঠেকিয়াছিল, সেই তুচ্ছ অপরাধে (মুসলমানেরা এমন নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ যে) তাহার প্রতি ঐরূপ গুরুদণ্ডের আদেশ করিল এবং এতদ্দ্বারা তিনি তাঁহার হিন্দু পাঠকদিগকে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর চরিত্র এবং তাহাদের গৌরব-রক্ষী বিচারের দিকে আকৃষ্ট করাইয়া, এই উভয় জাতির মধ্যে এক প্রবল প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষোদ্ভবী বীজ বপন করিয়াছেন। হিন্দুরাও দেখি সেই কথাতেই আস্থাবান। স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই তাহারা মুসলমানদের সহিত একতা করিতে প্রস্তুত নহে। উন্নতির বুদ্ধিই বটে।

৪ ❋ গাছে নাচে কুলবালা। ❋ ৪

গঙ্গারামের ভগিনীর নাম শ্রী। ইনি সীতারামের প্রথম পক্ষের স্ত্রী হইলেও, ইহাকে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইনি এলো মাঠে চরিয়া খাইয়া ঈশ্বরেচ্ছায়

পঁচিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাকে বিবাহ করিয়া পরিত্যাগ করিবার কারণ, ঠাকুর যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে শ্রীর হাব-ভাব চাল-চলন যেমন দেখাইয়াছেন, তাহাতে বিবেচনা হয় তিনি এক অভূতপূর্ব্ব রাক্ষসী। তিনি যে ভয়ানক দুশ্চরিত্রা ও পাপে পরিলিপ্তা মহাপাপিষ্ঠা; তাহার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায় এবং বিবেচনা করি চরিত্র দোষের কারণেই ইনি শ্বশুরালয়ে স্থান পান নাই। নভেল লেখকেরা তদীয় গ্রন্থগত ব্যক্তিদিগের গতি-মতি ও চাল-চলন আদির স্রোত সকল যে ভাবে খাড়া করেন, সেই স্রোতের সামঞ্জস্য-সূচক-গতি, সকল স্থলে সেইভাবে রাখিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থের সামঞ্জস্য থাকে না। শ্রীর স্বাভাবিক চরিত্র যে ভাবে গ্রথিত করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে, বাল্যকাল হইতেই দুশ্চরিত্রা বলিয়া মনে হয়। ধৃষ্টতা ভিন্ন, সন্ন্যাসিনীর গুণ তাঁহাতে থাকিতেই পারে না।

অন্ততঃ দশ বার বৎসরের পর, কেবল মাত্র গঙ্গারামকে উদ্ধারের জন্য, শ্রী সীতারামের বাড়ীতে গেলেন। সীতারাম তখন ভূষণায় বাস করিতেন। ফৌজদার তাঁহাকে নিরীহ ভদ্রলোক বলিয়া জানিতেন। যে শ্রী এতকাল স্বামীকে মুগ্ধ করিতে পারেন নাই,আজ সেই শ্রী,সেই স্বামীকে, এমন মুগ্ধ করিলেন যে,সীতারাম গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য, যথা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না শ্রী ফাঁকি দিয়া পাখী মারিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। (পাঠক ক্রমশঃ দেখিবেন, শ্রী কিছুতেই স্বামীসেবা স্বীকার করিবেন না, তথাপি নভেল ঠাকুরের চক্ষে তিনি দেবী ও নগরলক্ষ্মী।)

নির্দ্ধারিত দিনে সীতারাম তাঁহার অসংখ্য দস্যুদলকে সঙ্গে লইয়া, বিরাট বধ্যমাঠে গমন করিলেন। (ঠাকুর যাহাই বলুন, সীতারাম তোরাবকে শিক্ষা দিবার জন্যই আসিয়াছেন।) বিরাট মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সেই মাঠের মধ্যস্থলে কবরের নিকট গঙ্গারামকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। কাজি সাহেব, ফৌজদার সাহেব, এবং রক্ষীবৃন্দ গঙ্গারামকে পরিবেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মাঠের এখানে সেখানে যে সকল বৃক্ষ ছিল, সে সকলের শাখে শাখে, রাশি রাশি নরমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। একটি বৃক্ষের উপর রূপবতী শ্রী, চণ্ডী মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া নাচিতেছেন। (সেই নর-সমুদ্রের মধ্যস্থলে, সীতারামের পত্নী একটি বৃক্ষ শাখায় পরিশোভিতা। সীতারাম যদি নিতান্ত নির্লজ্জ ও দস্যুপ্রকৃতির নরাধম না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে দিন সে, গঙ্গারামের কবরে নিজে প্রবেশ করিয়া

মুখ লুকাইত। কিন্তু নভেল ঠাকুর এই শ্রী আর এই সীতারামকে দিয়া হিন্দুর গৌরব দেখাইয়াছেন। এই শ্রী হিন্দুদের দেবী, এই সীতারাম তাহাদের রাজা! এমন পুস্তক যাহারা রুচি সহকারে পাঠ করেন, তাহাদের রুচিকে ধন্য! আর এইরূপ পতিত রুচি লইয়া-যাহারা স্বরাজ বা স্বাধীনতা কামনা করে, তাহাদের কামনাকেও ধন্য! ঠাকুর এই নরপিশাচ সীতারামকে কল্পনায় রাজা করিয়া কোতয়াই পাঠক-দিগের ক্ষোভক্ষয় করিয়াছেন।

সীতারাম সদলবলে, সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একাকী তোরাব খাঁয়ের নিকট আসিলেন। এবং কপটতা সহকারে, প্রথমতঃ গঙ্গারামের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলেন। এবং তজ্জন্য, ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া, দ্বাদশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, অর্থাৎ একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উৎকোচ দিতে চাহিলেন; তথাপি সেই নিষ্ঠুর তোরাব গঙ্গারামের প্রাণদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

(নভেল ঠাকুর এইরূপে, কল্পনায় কীট সাজিয়া, মুসলমান কাননের প্রসূন বিনষ্ট করিয়া আপনাকে 'ধন্য' মনে করিয়া লইলেন, কিন্তু ঠাকুরের বুদ্ধিভাণ্ডারে যদি অধিক না, কেবল একটি মাত্র ছায়াপ্রদর্শী দর্পণ থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, তিনি যে মসীর প্রহারে মোমেনবদন কাল করিবার জন্য, প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই মসী, তাঁহাকেই সং সাজাইয়া দিয়াছে।—'একটা নিতান্ত তুচ্ছ দোষের জন্য,একজন ভদ্রলোককে জীবন্ত গোর দিবার হুকুম হইল' এইরূপ কথা বিশ্বাস করিবার জন্য তেমন 'আদাড়ে-বুদ্ধি মানব' ইহলোকে কেহ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ! —আবার তার উপর বার হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিলেও ক্ষমা করিল না!—এই জগন্মধ্যে যাহাকে আমরা সকলের অপেক্ষা স্থূলবুদ্ধি মনে করি, যদি তেমন একজন মূর্খব্যক্তির নিকট এই বিচার ফেলা যায়।—সেও একথা একদম বিশ্বাস করিবে না, এবং শুনিলেই, ইহাকে প্রতিহিংসার পরিচায়ক বলিবে।—সে আরও বলিবে যে, দুষ্ট গঙ্গারাম নিশ্চয় মানুষ খুন করিয়া থাকিবে।—সীতারাম যাঁকে কখনও ভ. ১ দিল না,শ্যালকের জন্য একলক্ষ বিশ হাজার টাকা দেবে!—আর অত টাকা পাইয়াও যাকে মার্জ্জনা করিতে চাহে না, সে নিশ্চয় অমার্জ্জনীয় পাপ করিয়াছে' সেই বোকা বিচারপতি বরং অবাক হইয়া বলিবে।—মুসলমানেরা কি নেমক হালাল ধর্ম্মপরায়ণ জাত,একরাশ টাকাতেও অধর্ম্ম করিতে চাহিল না!—এমন ফেরেস্তা চরিত্র না হইলে, এত লোক থাকিতে বিধাতা, মুসলমানকে রাজ্যভার দিবেন কেন?' সেও হয় তো হা হা রবে হাসিয়া বলিবে—'আমাদের নভেল ঠাকুর যদি কাজি সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত

হইতেন তাহা হইলে, বিশ ত্রিশ টাকাতেই তিনি গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন সে হয় তো আরও কল্পনা করিয়া বলিত।—'তোরাবের সেই দলটা যদি ইদানীন্ত ইংরেজ রাজার বাবু কর্ম্মচারীদের দল হইত, তা' হলে—'থাম! আচ্ছা ধর— তোরাপের জন্য ৫০৲, কাজির জন্য ৩০৲, আম্লাদের ২০৲, রক্ষীদের ১০৲—যাই হব দেড় শতের মধ্যে এই মহাকাজ মিটিতে পারিত।" এই বলিয়া আবার একবার হু করিয়া হাসিয়া বলিত, 'কাজটা যদি এ কালের দারোগা বাবুর হাতে পড়িত, তা'হলে তিনি ঘুসটা লইয়া চাকরিতে এস্তাফা দিয়া, সাফাই সরিয়া পড়িতেন।'—মোটকথ যাঁহারা এরূপ লেখেন তাঁহারা, নিজেরাই নিজ নিজ চরিত্র আঁকেন এবং বু বাতীতে জ্যোতি নাই বলিয়া সে কথা আদৌ বুঝিতে পারেন না।)

গঙ্গারামের ন্যায় পাতকীকে, তোরাব খাঁয়ের ন্যায় ন্যায়বিচার পতির নিকট হইতে ঘুস দিয়া খালাস করা যে একান্ত অসম্ভব; সীতারাম তাহা বিশেষ রূপেই জানিতেন সেই কারণে তিনি ফৌজদারের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন ইঙ্গিত করিতেই 'মার মার' শব্দ আরম্ভ হইল। চণ্ডীদেবীরূপিণী শ্রী, বুদ্ধিবীর হি দলকে সম্বোধন করিয়া প্রসারিত বাহুসঞ্চালিত করতঃ সোৎসাহে রণে অনুপ্র করিতে লাগিলেন।—'মার, মার, নেড়েদের মার।' পতঙ্গবুদ্ধি জাতির বুদ্ধিই আ কত, সেই পরিচিতা পাপিষ্ঠাকে চণ্ডীদেবী মনেকরিয়া সকলেই বীরদর্পে 'মার মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সীতারামের দস্যুরা লাঠী ধরিল, ফৌজদারে সহিত হাঙ্গামা করিতে লাগিল। গাছের উপর দেবী প্রাণপণে চীল-চীৎকারস্বরে 'মা নেড়ে' বলিয়া উন্মাদিনীর মত নাচিতে লাগিলেন।—এই বধ্যভূমে তোরাব সসৈ আসেন নাই, তাই তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। 'তোরাব অপমানি হইয়া ছয়বৎসর কাল নীরব রহিলেন। প্রতিশোধ ও বিদ্রোহ দমন করিতে চে করিলেন না। (বোধকরি নভেলঠাকুর তোরাব খাঁকে পরামর্শ দিয়া থাকিবেন যে সীতারামের সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত নাই, তাহার রাজ্য এবং সেনা যতদিন প্রস্তুত না হয় আপনি যুদ্ধটা মুলতবি রাখুন।—তাই ভাবি এমন মাথাওয়ালা মানুষও বঙ্গদে জন্মিয়াছিল। এ ব্যক্তির রাজবুদ্ধি, বিচার শক্তি ও কল্পনাদি জ্ঞান-গুণের সৌন্দর্য্য সামঞ্জস্য দেখিয়া আমরা চৈতন্যহীন প্রতিমায় পরিণত হইয়াছি।)

(পাঠক বুঝিতে পারেন কি এখানে সীতারাম, কি কৌশলে গঙ্গারামকে উদ্ধা

লইবার মানসে, যে সকল নির্লজ্জ ভাব-ভঙ্গিমায়, বৃক্ষের শাখায় শাখায় লম্ফ দিয়া বাজীকরী নর্ত্তন-কুর্দ্দনে,তাহাদের কামরুচির পরিবর্দ্ধন করিয়াছিল তাহাতে, বিশেষ করিয়া যে সকল রক্ষী গঙ্গারামকে বেষ্টন করিতেছিল, তাহাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল; তাহারা হা করিয়া শ্রীর অঙ্গ-প্রতঙ্গ পরিদর্শন করিতে লাগিল। শ্রী, এ ডাল সে ডাল করিয়া নাচিতে নাচিতে, সহসা সেই সকল রক্ষীদের ঘাড়ে পড়িল। রক্ষীরা যেন সিন্নি পাইয়া, পরস্পরে সিন্নি লুণ্ঠনে মনোযোগী হইল। ঠাকুর বলিতেছেন, 'সীতারাম ফকিরকে কাটিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে শ্রী সহসা বৃক্ষচ্যুতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা-প্রায় হইলেন।' আমরা বলি—শ্রী রক্ষীদের ঘাড়ে পড়িলে, ফৌজদারী কার্য্যে যে এক পরিবর্ত্তন আসিয়া যায়, সেই গণ্ডগোলে, সীতারাম গঙ্গারামকে সরাইয়া ফেলে এবং অন্য একজনকে দৌড় করাইয়া 'ঐ গঙ্গারাম পলাইতেছে' বলিয়া, সেই লোককে দেখাইয়া দেয়; ফৌজদারীর লোক, ভ্রমে পড়িয়া সেই জালব্যক্তির প্রাশ্চাতাবলম্বন করে।—নচেৎ যে ফৌজদার, একটা ফকিরের অঙ্গে 'পাদস্পর্শ' করিবার তুচ্ছ অপরাধের জন্য জীবন্ত গঙ্গারামকে গোর দিতে দাঁড়ান, 'সেই ফকিরের মাথা কাটা, আর সেই তোরাবকে অপমান করা, অপরাধের জন্য, সে তোরাব তৎক্ষণাৎ তথাকার গ্রামসমূহ পোড়াইয়া, সমস্ত হিন্দুকে জীবন্তে গোর দিবে, অথবা ছয়বৎসর ধরিয়া গায়ের আগুন গায়ে মাখিয়া থাকিবে?—ঠাকুর না হলে এমন জমুর্দাল কথা ভাঁজে কে? আর অধঃপতিত জাতি না হলে এমন আদাঁড়ে কথায় কান দেয় কে? এই বাঙ্গালী স্বরাজ লইবে।)

৫ ❋ সতীর গতিমতি। ❋ ৫

গোল নিবিয়া গেল, সকলে আপন আপন আবাসে চলিয়া গেল। নির্লজ্জ, সীতারাম, তাহার কর্ম্মচারী চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, এবং গঙ্গারাম, শ্রীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। বরলা চক্রে লগার খোঁচা দিয়া, এবার তাঁহারা চিন্তাকুল ও ভয়বিহ্বল হইয়াছেন। ভূষণায় প্রবেশ করি[illegible] আর তাঁহাদের সাহস হইতেছে না। এক্ষণে যাইবেন কোথা, সকলে মিলিয়া সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতা লইয়া আলোচনা করিয়া সীতারাম, গঙ্গারাম এবং চন্দ্রচূড়কে শ্যামপুরে যাইতে আদেশ করিলেন। 'ঐ ক্ষুদ্রগ্রামে যাইয়া আত্মরক্ষা না করিলে আর রক্ষা নাই।' তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্যামপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

সীতারাম শ্রীর কার্য্যকলাপে ভাবিলেন। ‘শ্রী একটা রমণী বটে, সভা গোলজার করিয়া ছাড়িয়াছে—এমন ‘রূপে গড়া গাছে চড়া’ শ্রীকে আর ছাড়া হইবে না। একে সঙ্গে রাখিতে পারিলে তোরাবকে নেড়া করিতে অধিক সময় লাগিবে না।’ এই ভাবিয়া তিনি শ্রীকে বলিলেন,—“তুমি আর এখানে থাকিও না, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি, তুমিও শ্যামপুরে যাও!” (গঙ্গারামের সঙ্গে পাঠাইলন না কেন?) শ্রী কাহারও সঙ্গে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন না। (কুলবতীকন্যা কিনা, পরপুরুষের সঙ্গে যাইতে পারেন কি?—রমণীর কিরূপ গুণ থাকিলে, বাঙ্গালীরা তাঁহাকে কুলবতী ও দেবীসদৃশা নারীরত্ন বলিয়া মনে করেন এবং কিরূপ রমণী তাঁহাদের রসনারুচ্য হইয়া থাকে;—ঠাকুর এস্থলে তাহারই এক সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন।) তখন সীতারাম বলিলেন।—“চল আমি স্বয়ং তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।”

শ্রী বলিলেন,—“এতদিন পরে এত অনুগ্রহ কেন?” তখন সীতারাম, শ্রীকে যে সকল কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। “স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর তোমার অদৃষ্ট গণাইয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে ‘তোমার কষ্টিতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে, অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া, শনির ত্রিশাংশগত হইয়াছে।—যাহার ঐরূপ হয়,—সে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হয়,—সেই আতঙ্কে, পিতা তোমাকে ত্যজ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।—এক্ষণে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব”(পাঠক বিবেচনা করুনঃ—যদি পিতার ভয়ের কারণটা সত্য হইত তবে, পিতৃবিয়োগের পরই সীতারাম শ্রীকে গ্রহণ করিতেন না কি?—যদি বল শ্রীকে দেখিয়া, তাঁহার অনুরাগ-সাগর বল প্রকাশ করিয়াছিল, তবে শ্রী যখন সীতারামের বাড়ী গিয়াছিল, তখনি তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন না কেন?—এখানে স্পষ্টই প্রমাণ পাইতেছে যে, সীতারাম শ্রীকে গাছের উপর নাচিতে দেখিয়া, তাহার প্রতি মুগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। ইহা নীচ লোকের রুচি নহে কি? কিন্তু যখন ইনি রাজা তখন এ রুচিকে ভদ্রলোকের রুচি না বলিব কেন? ঠাকুর এখানে হিন্দুরাজাকে কেমন রুচিব্য অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। পাঠকেরাও যখন হিন্দুরাজ্য গঠন করিতে বসেন তখন, এইরূপ গুণবান্‌কেই নেতারূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পতিত জাতি ভিন্ন অন্য কেহই, এরূপ দুষ্য গ্রন্থ ও দুষ্য শিক্ষার উপাসক হয় না। পতিতবুদ্ধি, রাজবুদ্ধি ফলাইতে পারে না।

শ্রী কিন্তু সীতারামে নাই। তাঁহার মনের-মানুষ সীতারাম নহে। তিনি বলিলেন, “তোমার পিতা স্বর্গে বলিয়া তুমি কি তাঁহার আদেশ পালন করিবে না?”

“সীতারাম বলিলেন,—“তিনি যদি অধর্ম্ম করিতে বলেন, তাহা পালন করিব

কেন?" সীতারাম যে কেমন ধর্ম্মপরায়ণ তাহা শ্রীর হাড় পর্য্যন্ত জানিত। তিনি স্পষ্টাক্ষরে খুলিয়া বলিলেন,—"আমার ভাইয়ের প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছ, তাহাই তোমার অশেষ গুণ!—আমার আর কোন ভিক্ষা তোমার নিকট নাই।—আমি এখন হইতে তোমায় শত যোজন তফাৎ থাকিব। (শ্রীর এই কথাটিতে স্পষ্টই প্রমাণ পায় যে, তাঁহার হৃদয়পদ্ম ভ্রমর শূন্য নহে। তিনি অন্য ভ্রমরের আকাঙ্ক্ষা করেন না।) এই বলিয়া শ্রী তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সন্ধ্যাকালের অন্ধকারে, এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সীতারাম আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।"

শ্রীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপরূপ শ্রী, সুশ্রী হাসির মনোহর শ্রী, গলার্দ্ধ লিতম্বের নর্ত্তন শ্রী, তরুশিরে লম্ফ-ঝম্পের চাঞ্চল্য শ্রী, বিকীর্ণ নয়নে মনোমুগ্ধকরিণী শ্রী, শ্রীমাখা শ্রীর অবয়ব শ্রী, সীতারামের হৃদয়পটে সুশ্রীরূপে অঙ্কিত হইয়াগিয়াছিল। শ্রী চলিয়া গেলে, সীতারাম আরও চঞ্চল এবং ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বনে বনে অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করিয়াও আর শ্রীকে দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা বাড়ীতে আসিলেন, কিন্তু মনের চঞ্চলতা নিবৃত্ত হইল না। নন্দা এবং রমা নামে তাঁহার আর দুই স্ত্রী আছে। নয়নাঞ্জলী রূপিণী রমাও তাঁহার চঞ্চলমন স্থির করিতে পারিল না। (বুদ্ধিটা দাস-নিকৃষ্ট হইলেও নভেল ঠাকুর ইহাকে সীতারামের রাজবুদ্ধি বলিয়া দেখাইতেছেন) সীতারাম যেখানে-সেখানে বসিয়া শ্রীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—'শ্রী কেন আমার অনুরাগিনী হইল না? কেন আমাকে পরিত্যাগ করিল? তাহার ভালবাসা ভাণ্ডার কি অন্য কেহ অধিকার করিয়া লইয়াছে? এমন রূপ, এমন মুখশ্রী, এমন গোলাঙ্গী কুরঙ্গী নয়না, এমন সরসাধরা বিধুবদনা শ্রী কি অবিশ্বাসিনী হইতে পারে? (ঠাকুর যাহার রূপ দেখাইয়াছেন তাহাকেই দেবী বলিয়াছেন, লোকেরও বিশ্বাস রূপবতীরা কখনই ভ্রষ্টা হইতে পারেনা। পতিত জাতির বিশ্বাস যে কতদুর সরল ও অধঃগামী, ঠাকুর তাহা উত্তমরূপেই জানিতেন।)

'শ্রী বাহিরে বাহিরে যাহাই করুক, ভিতরে অর্থাৎ অন্তঃপুরে আসিলে সে ভালই হইবে। সে কোথাও কিছুই করুক, তেমন সোণার জলে রং করা বিধুবদনা শ্রীকে এবার পাইলে আর ছাড়িব না।' এইরূপ ভাবিয়া সীতারাম, শ্রীর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার পাতা পাইল না। গঙ্গারাম নিষ্ফলে কত দেশ ভ্রমণ করিলেন। অবশেষে সীতারাম শ্রীর আশায় জলাঞ্জলি দিয়া জমিদারীর শ্রী বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন।

৬ ❋ কাগজ-রাজ্যে রমারাণী। ❋ ৬

তোরাব খাঁয়ের ভয়ে সীতারাম ভূষণা ত্যাগ করিয়া, শ্যামপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অনুগত বিস্তর অবসর-প্রাপ্ত দস্যু ভূষণায় অবস্থিতি করিত। তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া শ্যামপুরে বসতি করিতে লাগিল। আবার তাহাদের দেখাদেখি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের লোক দলে দলে ভাঙ্গিয়া সীতারামের রাজ্যে আসিয়া আবাস নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। (হিন্দুরাজ্য হইবে বলিয়া এক হুজুগ তুলিয়া দিতেই, এ কালের মত তাহারাও সে কালে, স্বদেশী করিতে মাতিয়া উঠিল। এখন যেমন সকলে বলিতেছে,—হিন্দুরাজ্য হইবে, তখনও তেমনি সকলে বলিয়াছিল,—হিন্দু রাজ্য হইবে। কেহ বলে না এবং অনুসন্ধান করিয়াও দেখে না, এ জাতির মাথায় সদ্‌গুণবিশিষ্ট কি এমন রাজবুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে যে, এ জাতি উন্নতি করিবে। এ জাতি তখনও যে কুকল্পনায় রাজ্য গড়িয়াছিল, এখনও সেই কল্পনাতেই রাজ্য গড়িতেছে। তখনও সেই হুজুগীদের পরিণামফল যেমন তিক্ত হইয়াছিল, এখনও ইহাদের শেষফল তেমনি গরলগর্ভী হইতেছে। কেন না নন্দ ঠাকুর এ জাতিকে রাজ্য পাইবার পন্থা সকল যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে এ জাতি কখনই রাজ্য বা স্বরাজ্য পাইবার উপযুক্ত হইবে না।) সীতারাম শ্যামপুরে বিস্তর প্রশস্থ পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই পথ সকলের ধারে ধারে, ভবন সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শ্যামপুর এক সুন্দর নগর হইয়া দাঁড়াইল। আপণ-বিপণিতে সর্ব্বত্র পূর্ণ হইয়া গেল। জমিদারীর আমদানী অনেক গুণে বাড়িয়া গেল। প্রজাগণ সীতারামকে রাজা বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। (দেখাদেখি, আমরাও আমাদের এই স্বদেশীয় সীতারামকে রাজা বলিতেছি।) সীতারামও দস্যুবুদ্ধিটা ত্যাগ করিয়া সাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হইলেন। (এই বঙ্কিম কাগজ-রাজ্যের নাম হইল,) হিন্দুর ধর্ম্মরাজ্য। এই ধর্ম্মরাজ্যের ধর্ম্মমন্দিরে, প্রথম সিন্নি, গুণবতী রমা রাণী চড়াইয়াছিলেন। গুণবান্ সীতারাম, সেই সিন্নির বিচার করিয়া হিন্দুর নিন্দনীয় গৌরব দেখাইয়াছেন। সব হইল কিন্তু তোরাবের ভয় কাহারও প্রাণ হইতে ঘুচিল না।—কালিমা মেঘসহ ঝড়বৃষ্টি লইয়া যখন তোরব খাঁ এই কাগজ-রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন এর নাম-নিশানাও থাকিবে না। বাঙ্গালীর হুজুগ তাহা সেকালেও দেখিতে পায় নাই, একালেও দেখিতে পাইতেছে না। আর মাথায় বঙ্কিম-বুদ্ধি বজায় থাকিতে, কখনও দেখিতে

পাইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। আর পতিত বুদ্ধি মাথায় থাকিতে, বঙ্কিম বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না।

সীতারাম তাঁহার তিন মহাপুরুষকে, তিন মহা কাজে নিযুক্ত করিলেন। মহামতি মৃণ্ময় মহাশয়কে তোপ গোলার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি সময় পড়িলে সেনাচালনাও করিবেন। গঙ্গারামকে সেনাপতি এবং শান্তিরক্ষার ভার দিলেন। চন্দ্রচূড় দিওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয়া, নগরের কালেক্টার হইলেন। পূর্ব্বে যাহারা সীতারামের দলভুক্ত ডাকাত ছিল, তাহারাই তাহার সেনাবল হইল।

শ্যামপুরের নাম ফিরাইয়া উহার নাম 'মহাম্মদ নগর' রাখা হইল। (পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন, হিন্দুরাজ্যে মুসলমানী নাম কেন? তবে বলিব ;—যে উদ্দেশ্যে ইদানীন্তন হিন্দুরা তদীয় সম্পত্তির উপর 'এডওয়ার্ড ডিসপেন্সারী' আদি ইংরাজী নাম রাখিতেছেন, মহাম্মদ নগর নামটিও সেই উদ্দেশে রাখা হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা ঠাকুর দেখাইতেছেন যে, এ জাতির বুদ্ধি সহস্রপুরুষ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, আজিও সেইরূপ আছে এবং সহস্র পুরুষ পরেও সেইরূপ থাকিবে। ইহাদের মাথার কল্পনা ফিরিল না, ফিরিবে না, ফিরিবার নহে। ইহাদের আত্মায় ভার নাই, শোলার মত আপনিই ভাসিয়া উঠে। এ জাতি এতদূর পতিত ও বুদ্ধিহত হইয়া পড়িয়াছে যে, কল্পনাতেও স্বাধীন হইবার ক্ষমতা আর ইহাদের নাই। পক্ষীরা লক্ষ লক্ষ পুরুষের পরও বাসা নির্ম্মাণের কৌশলান্তর পায় কি?)

শত্রুভয়ে নগরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া চারিদিকে চারিটি তোরণ নির্ম্মাণ করা হইল। সমগ্র নগরখানি এক বিরাট মহিলা-মহল প্রায় অপরিসীম অন্তর শোভায় পরিশোভিত হইল। (রাজ্য দেখিয়া ঠাকুরের পতিত বুদ্ধি পাঠকদল যেন স্বর-সিন্নি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দমনে স্ব স্ব দুষ্য কল্পনাকে ভোগ দান করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণ মাথায় এইরূপ দুষ্ট কল্পনার ছায়া পড়িতে পড়িতে, তাহাদের কল্পনাও অলীকপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কল্পনায় কি সত্য রাজ্যের দর্শন পাওয়া যায়।)

সেদিকে ফৌজদার তোরাব খাঁ, সীতারামকে সবংশে নিপাত করিবার আদেশ নবাবের নিকট হইতে অনেক দিন হইল পাইয়াছেন। (কিন্তু সীতারাম প্রস্তুত হইতে পারেন নাই বলিয়া, ঠাকুরের আদেশমত তিনি সীতারামকে আক্রমণ করিতে পারিতেছেন না।) সীতারামকে মাঝে মাঝে সংবাদ করিতে লাগিলেন ; ঠাকুর তাহা কৌশলে কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। "আপনি যাহার নামে গ্রেফতারী

পরওয়ানা পাঠাইয়াছেন, ঐ নামের কোন লোক এ গ্রামে নাই।" অমনি তোরাব খাঁ বোকা হইয়া গেল, নবাবও আক্কেল হারাইল, দিল্লীর সম্রাট মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। (ঠাকুর এখানে পুকুর দেখাইয়া সমুদ্রকে আতঙ্কিত করিয়াছেন। এবং পাঠকদের ঘাসভরা মাথায় কাগজের গোলাপফুল ফোটাইয়া তন্মধ্যে দাস-বুদ্ধির কুবাস ভরিয়া রাজবুদ্ধির সুবাস বলিয়া বিক্রয় করিয়াছেন। পতিত বুদ্ধি কবিরা রাজ বুদ্ধির ব্যাখ্যা করিতে গেলে, এইরূপ হীন-নিকৃষ্ট কল্পনাই করিয়া থাকে। বনমানুষে কি নগরের ছবি আঁকিতে পারে?)

এইরূপ পরওয়ানা নগরবাসীদিগকে অত্যন্ত ভীত করিয়া তুলিল। সকলকে ছাপাইয়া রমারাণীর ক্ষুদ্র হৃদয় শতগুণ অধিক ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। তিনি স্বপ্নে-জাগরণে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর উৎক্রোশ বিকাশী প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। (নভেল ঠাকুর এখানে মুসলমানদের রূপ-বর্ণনায় প্রীতি লাভ করিয়া বর্ণিতেছেন।) এখন রমা সেই অসংখ্য মুসলমানদের দন্তশ্রেণী প্রভাসিত, বিশাল শ্মশ্রুল বদন-মণ্ডল রাত্রিদিন চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন"। (ঠাকুর এবং ঠাকুরের ন্যায় আরও কত ঠাকুর যে এরূপ কথা লিখিতে এবং পড়িতে অনন্দানুভব করেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে। কিন্তু জ্ঞানীরা ইহা পাঠ করিবার সময়ে তাঁহাদের স্মৃতিমধ্যে যে চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন তাহা এইরূপ;—'এখন রমা এবং নগরের কাপুরুষদল, সেই অসংখ্য মুসলমানদের দন্তশ্রেণী প্রভাসিত বিশাল শ্মশ্রুল, বদন মণ্ডল যেন চাক্ষুষ দেখিয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন। সেই ভাবী-বিপ্লব-কালে, কে কিরূপে কোথায় লুকাইবে, তজ্জন্য কেহ বা খড়ের পুঁড়ে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কে কোন্ হাঁড়িটা মাথায় দিয়া জলে ডুব দিবে, তাহা লইয়া হাড়ি কাড়াকাড়ি চলিতে লাগিল, কে কোন্ জালাটায় বসিবে, তাহার ফিকির চলিতে লাগিল। যাহারা হনুমান সাজিয়া গাছে বসিবে, তাহারা ল্যাজ গড়িতে লাগিল। যাহারা তেলকালি মাখিয়া ঠাকুরঘরে বসিবে, তাহারা কালি প্রস্তুতে মন দিল। আর যে সকল রমণী তাহাদের রূপ এবং যৌবন দেখাইয়া সেনাদিগকে হৃদপিঞ্জরাবদ্ধ করিবে, তাহারা রমার ন্যায় বেশভূষা গুছাইতে লাগিল ইত্যাদি। তাই বলি ঠাকুর, আপন তুলিতেই আপনি সং সাজেন—আফসোস্! এমন তুলি ধরিতে লজ্জা করিবার বুদ্ধিটিও কোন লেখকের মাথায় নাই।—এদেশে সকলেই নকল-নবীস জন্মিল।

"মুসলমানদের সহিত সন্ধি করিবার জন্য রামারাণী অবিরত সীতারামকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সীতারাম রমাকেই অত্যন্ত ভালবাসিতেন; পরন্তু ঘন ঘন

সাক্ষাতের সহিত তাঁহাকে ঘন ঘন সন্ধির কথা শুনিতে হইত। অনবরত কাঁদাকাটি, হাতেধরা, পায়েপড়া, মাথাখোঁড়া, ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান, কখনও মলয়ের হাওয়া, কখনও ইলশে গুড়ুনী, কখনও কাল-বৈশাখী, কখনও কার্ত্তিকে ঝড়—ধুয়োটা সেই এক—'মুসলমানদের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়।' সীতারামের হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সীতারাম ভাবিল,—'গুরুদেব! রমার ভালবাসা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।' (মূর্খেরা জ্ঞানীজনকে যে ভাবে হতবুদ্ধি বলিয়া ভাবে, এখানে সীতারাম এবং তাঁহার অনুচরবর্গ, রমাকে সেইভাবে হতবুদ্ধি বলিয়া ভাবিয়াছেন। রমার দূরবীক্ষণ বুদ্ধিটাই যে, কার্য্যকালে সত্যে দাঁড়াইবে, সে কথা কেহই চিন্তা করিতে তখনও পারে নাই, এখনও পারিতেছে না। ভীরুজাতির বীর সাজা আর পিপীলিকার পালক হওয়া একই কথা নয় কি?)

বুদ্ধিবীর সীতারাম রমার সংস্রব ছাড়িয়া দিলেন। (একটা স্ত্রীলোকের মনে প্রবোধ দিতে পারিলেন না, ইনি লক্ষ লক্ষ বিপরীতবুদ্ধি মানবকে সামলাইবেন।) রমার সহিত আলাপ-পরিচয় বন্ধ করিয়া দিলে, তিনি আরও ভীত হইলেন। তিনি মনে মনে, **স্বামীর সম্পদ-ধ্বংসী-বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া, কোন বীরবুদ্ধি মনস্বীর সাহস-প্রভাসী বাক্যরাশির দাসী হইয়া থাকিবার জন্য লালায়িতা হইলেন।** যেমন রাজা, তেমনি রাণী, মোটা বুদ্ধি নন্দাই, গোটা বাড়ীর গৃহিনী হইল।—সে স্বামীর কার্য্য-কলাপে দ্বিরুক্তি করিত না। (বুদ্ধি থাকিলে তবে করিবে। পতিত জাতির মধ্যে বুদ্ধির সমাদর করিবার বুদ্ধি কোন স্থলেই দেখিলাম না।)

সীতারামের তিনটি পাখী, একটি তো পিঞ্জরে প্রবেশই করিল না। একটি অযতনে খাঁচা কাটিবার চেষ্টায় আছে। কেবল একটি এখনও সীতারাম বুলী বলিতেছে। (পতি-বিরহিণী রমা, বাতায়ন-পার্শ্বে মুখ ঝুলাইয়া বসিয়া, মলিন বদনে চিন্তামগ্না থাকিতেন। সেই বাতায়নে বসিলে নগরের কেল্লা এবং গঙ্গারামের বিরাম মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। গঙ্গারাম তাঁহার শয়নমন্দিরে বসিয়া রমার রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। রমার রমিত মূর্ত্তিখানি স্মৃতিপটে আঁকিয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে দুইজনের মধ্যে আকার-ইঙ্গিতে কথা চলিতে লাগিল। ক্রমে বায়ুপথে চুম্বন প্রক্ষিপ্ত হইতে ও মন কাড়াকাড়ির খেলা চলিতে লাগিল। দূরে দূরে যাহা হইবার সব হইল; কেবল একাসন হইবার কোন উপায় পাইল না। রমার ইচ্ছা, এমন রাজ্যটা নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি এমন কোন বুদ্ধিবীর বাঙ্গালী ইহা রক্ষা করিতে পারেন, তিনি তাঁহারই দাসী হইয়া থাকিবেন।

৫ ✳ শ্রী এখন জয়ন্তীর জায়া। ✳ ৫

(নভেল ঠাকুর তাঁহার একাদশ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিয়াছেন, সে কেবল তাঁহার পাঠকগণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য। তিনি বলিতেছেন বৈতরণী তীরে যাইয়া শ্রীর সহিত জয়ন্তীর সাক্ষাৎ হইল। আমরা বলি তাহা নহে, শ্রীর সহিত জয়ন্তীর বহুকাল হইতে পরিচয় ছিল। জয়ন্তীর উপদেশ মতেই শ্রী, চণ্ডীদেবী সাজিয়া বৃক্ষশাখায় নাচিয়াছিলেন। জয়ন্তী তখন একটা বনে লুকাইয়াছিলেন। শ্রী তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়া একাকিনী সেই বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। জয়ন্তী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দেশান্তরী হইয়াছেন। (এই জন্যই শ্রী, সীতারামকে বলিয়াছিলেন—'আমি কাহারও সঙ্গে যাইব না—আমি তোমার সহস্র যোজন তফাৎ থাকিব।' জয়ন্তী যে কে? নভেল ঠাকুর তাহার পরিচয় দেন নাই।—আমরা তাহার পরিচয় দিয়া পাঠককে স্তম্ভিত করিব।)

উড়িষ্যা দেশে বৈতরণী নদীর স্থিতি। এখন যেস্থলে রেলপথ ঐ নদী পার হইয়াছে, তাহারই কিছু উত্তরে ঐ নদীতীরে, জয়ন্তীর পার্শ্বে শ্রী বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী, শ্রীকে বলিলেন,—"শ্রী! গৃহত্যাগিনী হওয়া কেমন সুখ?"

পথ পরিশ্রমে শ্রীর সর্ব্বশরীর ক্লান্ত হইয়াছিল, তিনি বলিলেন,—"এই পার্ব্বত্য দেশের কোন একস্থলে কুঁড়ে বাঁধিয়া থাকিলে হয় না?"

সন্ন্যাসিনী,—"কেন, সীতারামের রাজপ্রাসাদ কি অপরাধ করিল?"

শ্রী—"তবে কেন, এতদূর আনিলে?" জয়ন্তী বলিলেন,—"আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমিও আমার মত সন্ন্যাসিনী সাজিবে।" শ্রী বলিলেন,—"কে বলিল সাজিব না? যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে সাজাও, আমি একমাত্র তোমার বশীভূত হইয়া সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি সে কথা, আর কতবার বলিয়া বুঝাইব?"

ঠাকুর বলিতেছেন—তখন নিভৃত এক বৃক্ষতলে বসিয়া, সেই রূপসী সন্ন্যাসিনী, শ্রীকে আর এক সন্ন্যাসিনী সাজাইলেন। কেশদামে ভস্ম মাখাইলেন, অঙ্গে গৈরিক বসন পরাইলেন। কণ্ঠ এবং বাহুতে রুদ্রাক্ষ ঝুলাইলেন। (এই অতিরিক্ত রুদ্রাক্ষমালা ও গৈরিক বসন, জয়ন্তী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন কেন?) সর্ব্বাঙ্গে বিভূতির লেপন করিলেন, পরে রঙ্গের দিকে মন দিয়া শ্রীর কপালে একটি টীপ দিয়া দিলেন। তখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—"এইবার দেখ আমার পার্শ্বে তুমি এবং তোমার পার্শ্বে আমি, কেমন শোভা পাইল"। (পাঠক, এই মনোহর শোভাটা মনে করিয়া রাখিবেন।

ঠাকুরের এই রহস্য আমরা পরে খুলিব।) এইরূপে সাজিয়া তাঁহারা বৈতরণী নদী পার হইলেন এবং যুগলরূপে শ্রীক্ষেত্রের পথ উজ্জ্বল করিয়া চলিলেন।

পথিক সকল এই রূপসীদ্বয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল,—"কি পরিমাই কিনিয়া মনে যাউছন্তি পারা?" কেহ বলিল,—"সে মানে দ্যাবীতা হ্যাব।" কেহ আসিয়া প্রণাম করিল, কেহ ধন-দৌলত বর মাগিল। একজন পণ্ডিত (ঠাকুরের তুল্য পণ্ডিত হইবেন কি?) তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল,—"কিছু বলিও না,ইহারা বোধ হয় রুক্মিণী সত্যভামা,সশরীরে স্বামী-দর্শনে যাইতেছে।" কেহ মনে করিল,—"ইহারা শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী।" (পাঠক এমন মনে করিবেন না যে, 'উড়ে ম্যাড়াদের আর বুদ্ধি কত?—উহারা জয়ন্তী এবং শ্রীকে দেবী বলিবে তায় বিচিত্র কি?' এই উড়ে ম্যাড়াকে জিনিয়া ম্যাড়া, বঙ্গদেশে জন্মায়, তাহা আপনি যদি না জানেন তবে পরে দেখিবেন। জয়ন্তী শ্রীকে লইয়া উড়িষ্যায় আসিয়াছে কেন, তাহাও পরে জানিবেন।)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের শেষে, নভেলঠাকুর শ্রীর পতিভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—"আমি চন্দন ঘষিয়া স্বামীর স্থলে দেওয়ালে মাখাইতাম; ফুলমালা গাছের ডালে ঝুলাইতাম—সুখাদ্য রাঁধিয়া জলে ভাসাইতাম—শেষে সেই স্বামীকে ফেলিয়া আসিয়াছি।" কথাটার অর্থ এই যে, একদিন স্বামীর জন্য অত করিয়াছিলাম, আর এখন আমার ঘাড়ে এমনি একি ভূত চাপিয়াছে যে, আর সেই স্বামীর মুখ দেখিতেও আমার ইচ্ছা নাই। এরূপ হইল কেন? জয়ন্তী, তুমি ওঁকে কোনরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছ কি? আমরা বিবেচনা করি তোমার ঐ সান্ন্যাস-বেশটাই ওকে পাগল করিয়াছে।)

এইরূপে চারিবৎসর কাল ভ্রমণ করিয়া, নানা দেশে নানা প্রকার শিক্ষালাভ করিয়া, একদিন জয়ন্তী শ্রীকে বলিলেন—"শ্রী, এইবার চল, তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট রাখিয়া আসি। একবারও স্বামী দর্শন করিতে তোমার মন চায় না কি? এখন তো তুমি বেশ কার্য্যপটু হইয়াছ। আর তো তুমি কথায় কথায় হাসিয়া ফেল না? চল, আমিও তোমার সঙ্গে থাকিব। সেখানে তোমার ভাই কি সুখ-দুঃখে আছেন, একবার দেখা করা উচিত নহে কি?)

শ্রী বলিলেন,—"আমার সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে না।—কেন, তুমি কি আমার ভার বহন করিতে অপারগ হইয়াছ? তুমি কি জাননা একমাত্র তোমার প্রেমে মজিয়া, আমি স্বেচ্ছায় স্বামী ত্যাগ করিয়াছি। এ সান্ন্যাসবেশ ছাড়াইবে যদি তবে পরাইলে কেন?" এই বলিয়া শ্রী অধোবদন হইলেন।

জয়ন্তী শ্রীকে পলকে পলকে চুম্বন করিয়া, তাঁহার প্রতি তাঁহার অপার প্রেম দেখাইতেন। এবারেও তিনি তাঁহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"শ্রী! আমি যে তোমায় কত ভালবাসি, তাহার পরিচয় আরও কি দিতে হইবে? সন্ন্যাসিনীর জন্য এদেশও যেমন, সে দেশও তেমনি।—সেখানে গেলে ভালই হইবে।"

শ্রী তাঁহার স্বামীর রাজপ্রাসাদে যাইতে স্বীকৃতা হইয়া বলিলেন,—"আমাকে তথায় রাখিয়া আসিবে না তো?" জয়ন্তী। "যদি তোমার স্বামীও তোমাকে এই যোগিনী হইতে পৃথক করিতে না পারে, তবে লইয়া আসিব।"

শ্রী। "আমি স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখি নাই, তাহাকে ভক্তি করিব না। তুমি আমাকে বৈরাগিণী সাজাইয়াছ। আমি তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, তোমাকেই করিব,—তবে যাহাতে আমার দাদার ভাল হয় তাহা করিবে কি?"

জয়ন্তী—"স্বামী পাইলে, সান্ন্যাস বেশ আপনিই অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িবে।"

শ্রী হাসিয়া বলিলেন,—"বুঝিয়াছি তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও।—বেশ চল—দেখি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইতে পারি কিনা।"

জয়ন্তী আবার শ্রীর অধর যুগলে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"শ্রী! তুমি আজ চারি বৎসর আমার সঙ্গে বনে বনে, কান্তারে কান্তারে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া আমার প্রতি কি অপরূপ ভক্তি দেখাইয়াছ তাহা আমি জানি—যে মহা উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে এবং নিজেকে এইরূপে ক্লান্ত করিয়াছি, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তোমাকে সেখানে যাইতে বলিতেছি। সে সকল কথা পথে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব; আমি তোমার দাদার জন্যই যাইতেছি। এক্ষণে তুমি যাইতে প্রস্তুত কিনা?"

শ্রী বলিলেন,—"আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইব।"

এইরূপে স্থিরীকৃতা হইয়া তাঁহারা মহম্মদপুর গমনে বহির্গতা হইলেন। পথে চারিদিক হইতে পথিক দল তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে লাগিল। তাঁহারা বিনা তরণী একটি পুষ্পের উপর আরোহণ করিয়া বৈতরণী নদী পার হইলেন। তাহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অবাক হইল। যাইবার কালে বিনা তরণী পার হইতে পারেন নাই। আসিবার কালে বিনা তরণী পার হইতে দেখিয়া, মনে হয় তাঁহাদের যোগাভ্যাস পূর্ণ হইয়াছে, পাশও পাইয়াছেন।

৬ ❋ রমারাণীর সিন্নি দান। ❋ ৬

আপন-বিপণি হাট-বাজারে মহাম্মদপুর এখন জনাকীর্ণ নগরে পরিণত। সীতা

রামের অসৎ মাথায়, এক অসৎ বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি তোরাব এবং নবাবের অজ্ঞাতে, একাকী দিল্লী হইতে শাহী সনদ হাসিল করিবার কল্পনা মাথায় আঁটিলেন, এবং ঐরূপে রাজা হইতে না পারিলে, তাঁহার বিপুল যত্নায়াসার্জ্জিত রাজ্য যে, কিছুতেই তোরাবের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না এবং বহুমূল্য সামগ্রী সকল মুসলমানদের ভোগে আসিয়া পড়িবে, তাহা স্থির-নিশ্চয়। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া একদিন তিনি বিস্তর উপঢৌকন লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় নন্দাকে প্রাসাদ-গৃহিণী এবং রমণী-কুল-তিলক করিয়া গেলেন। গঙ্গারামের হাতে সৈন্য-সামন্ত দিয়া নগরপাল করিলেন। চন্দ্রচূড় ঠাকুর কাগজ-রাজ্যের কর আদায় করিবেন এবং প্রজাপালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। মৃন্ময় গোলাগুলি প্রস্তুত করিবেন এবং সময় পড়িলে যুদ্ধ করিতেও যাইবেন। কর্ম্মচারী সকলকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, এবং সাবধান সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে বলিয়া, তিনি সশরীরে দিল্লী যাত্রা করিলেন। রমা এইবার নিজ বুদ্ধি চালাইবার পথ পাইলেন।

"সীতারাম চলিয়া যাইবার পর, একদা এক নিশার গভীরে মুরলা নাম্নী এক প্রাসাদ-দাসী, গঙ্গারামকে পথে ধরিয়া বলিল,—"আপনাকে ছোটরাণী স্মরণ করিয়াছেন—চলুন।" গঙ্গারাম হর্ষাতঙ্কে বিচলিতচিত্ত হইয়া, ভয়োৎফুল্ল প্রভাবে উত্তর করিলেন,—"এমন নিশার নির্জ্জনে ডাক কেন?"

ঠাকুর বলিতেছেন, তখন মুরলা উত্তর করিল,—"আপনি আসিতে সাহস না করেন আসিবেন না, কিন্তু যদি এই সাহস না থাকে, তবে মুসলমানদের হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবেন কি প্রকারে?" (এখানেই স্পষ্ট প্রমাণ পায় যে, রমা একজন সাহসী এবং বুদ্ধিবীর পুরুষের অনুসন্ধানে আছে। তাই মুরলাকে বলিয়া দিয়াছিল, গঙ্গারামকে যদি ভীরু বলিয়া দেখ তবে আনিও না। গঙ্গারাম ভাবিল, লম্পট-লীলার সাহসী হওয়াই কি হিন্দুরাজ্যের জন্য বীরত্বের পরিচায়ক?) পরন্তু গঙ্গারামকে মুরলার সঙ্গে যাইতে হইল। মুরলা অগ্রে অগ্রে চলিল এবং রাজ-ভবনের খিড়কীদ্বারে আসিল। দ্বারে এক মুসলমান দ্বারবান দণ্ডায়মান। মুরলা বলিল,—"কেমন পাড়ে ঠাকুর, দ্বার খোলা রাখিয়াছ তো?"

পাঁড়ে বলিল,—"হাঁ রাখিয়েছে (গঙ্গারামকে দেখাইয়া) এ কোন?"

মুরলা। "এ আমার ভাই;" পাঁড়ে। "মরদ যাতে পার্ব্বেনা।"

মুরলা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"ইঃ কার হুকুম চাই!—আমার হুকুম, ছাড়!—খ্যাংরা মেরে দাড়ী মুড়িয়ে দেব জানিস না" (ইনি পাঁড়ে না মুসলমান?

এই মুসলমান দ্বারবানের দাড়ীর উপর রাগ ঝাড়িয়া, ঠাকুর এবং ঠাকুরের মত ঠাকুরেরা বড়ই আনন্দানুভব করেন। কিন্তু মুরলার কথায় প্রমাণ পায় যে দ্বারবানটা তাহার অনুগৃহীত। কি সুবাদে যে, ঠাকুর এর দাড়ীর উপর ঠাট্টা করিলেন তাহাই এস্থলে চিন্তার বিষয়। ইহা কি অসভ্য সুলভ ঠাট্টা নহে?)

এই মুসলমান প্রহরীটি মুরলার উপপতি, কাজেই সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। মুরলা গঙ্গারামকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। (কিগো! এই হিন্দুরাজ্যের পুরোদাসী হইতে বিবিরা পর্য্যন্ত কি, একই ছাঁচায় গড়া সামগ্রী? —না, রাজবুদ্ধির অভাবে শিব গড়িতে বানর হইল। তাই বুঝি, আমরাও আমাদের এই স্বদেশীতে কেবল বানরই গড়িতেছি। ইহা কি সীতারামের প্রাসাদ অথবা বিরাট বেশ্যালয়? এইরূপ দুর্গন্ধময় কল্পনায় মাথা তাজা করিয়াই আমরা সকল কার্য্যেই বিফলকাম হইতেছি কি না?)

মুরলা গঙ্গারামকে এক নীরব কক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল,—"ইহার ভিতরে প্রবেশ করুন, আমি নিকটেই রহিলাম—ভিতরে যাইব না। (এ কেমন কথা? এমন কথাও কি ঠাকুরদের গায়ে বাজে না? এ যে দেখি বেশ্যালয়ের রং করা ছাব! এইরূপ নভেল পড়া নারীরাও তো এই সং দিতেছে। তাই ভাবি ঠাকুরের কল্পনা মতে যদি হিন্দুরাই এ দেশের রাজা হন, তবে দেশে ও রাজ-প্রাসাদে কি এই লীলা আবির্ভূত হইবে?—মাথাটিতে রাজবুদ্ধি থই থই করিতেছে।)

কক্ষে প্রবেশ করিয়া গঙ্গারাম দেখিল, মহামূল্য দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রজত পালঙ্কে বসিয়া এক স্ত্রীলোক। উজ্জ্বল দীপাবলীর স্নিগ্ধরশ্মি তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে, সে অধোবদনে চিন্তা করিতেছে। তথায় আর কেহ নাই। (অর্থাৎ রমা তাহার শিশুছেলেটিকেও সেখানে রাখে নাই। গঙ্গারামকে দেখিয়া রমা অবগুণ্ঠন দিল না কেন? সে গৃহে প্রবেশ করিতেই রমার চাঁদ মুখখানি দেখিতে পাইল।—আমরা যে, রমাকে বাতায়নে বসিয়া প্রেম করিতে দেখিয়াছি, তাহা সত্য কি না? প্রথম সাক্ষাতে এমন নির্লজ্জ ভাব কোন রমণী দেখাইতে পারে কি? গঙ্গারাম রমাকে কক্ষান্তরে বসাইল না কেন? মুরলাকে নিকটে রাখিতে কি দোষ হইল? মুরলাকে বাহির-প্রহরায় বসাইল কেন? আবার কি করিয়া ছবি আঁকিলে, তবে তোমার বিশ্বাস হইবে যে, রমা রাক্ষসী? এরূপ গ্রন্থ পড়িলে এ জাতির বড় ঘরের ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বাকি থাকিবে কি? এ কথা যদি

পতিত জাতির জ্ঞানগম্য হইবে তবে তাহারা পতিত হইবে কিসে! নগরবাসীরা বনফল খায় না বলিয়া, বনবাসীরা তাহা ত্যাগ করে কি ?)

রমা প্রণাম করিয়া গঙ্গারামকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। (সেই নীরব-নিশীথে, গঙ্গারামকে নির্জ্জন কক্ষমধ্যে লইয়া, কক্ষদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া নভেল ঠাকুর, সেই দুইজনের মধ্যে যে সকল কথার আলোচনা করাইয়া, পাঠকগণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছেন ; উহা দিনমানের আলোচ্য কথা নহে কি ?—ঠাকুর এতদ্দ্বারা তাঁহার পাঠকগণকে শিক্ষা দিতেছেন যে,—'তোমার যদি দুই তিন পত্নী থাকে, তাহারা যদি রমা ও শ্রীর মত কোন কার্য্য করে. তাহাতে তুমি তাহাদের অসতী মনে করিও না।' আর পাঠিকাগণকে শিক্ষা দিতেছেন।—'কানন-মধ্যে পুষ্পশ্রেষ্ঠ সেই, যে বহু ভ্রমর বিবৃতা থাকে। অতএব তোমরা আদরণীয়া তখন, যখন দেখিব পঞ্চজন তোমাদের দ্বারদেশে আসিয়া শিরঘর্ষণ করিতেছে।)

(এক পতি বিরহিণী রমণী, তাহার শিশুপুত্রকে অন্যত্র রাখিয়া বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতে, দুষ্টা মুরলা বাঁদীর মার্ফতে, দ্বারবানকে প্রেমঘুস দিয়া, এক চির অবিবাহিত যণ্ডা পুরুষকে নিশার-গভীরে শয়ন-মন্দিরে লইয়া দ্বারাবরুদ্ধ করিয়া কি করিল, তাহা যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, সেই পতিতবুদ্ধি মানব। সেই নভেল ঠাকুরের বচন প্রবাহে কুটাভাসা হইয়া ভাসিয়া যায়। তাহারাই নিজেদের নিন্দা নিজেরা করে। Purgery—ঠাকুরের গ্রন্থগুলি পার্জ্জারিতে পরিপূর্ণ। ঠাকুর একস্থলে বলিয়াছেন গঙ্গারাম চির অবিবাহিত, অন্যস্থলে বলিয়াছেন সে বিবাহিত। তাঁহার নভেলে এরূপ কথা রাশি রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি তিনি সুকল্পী কবি এবং সাহিত্য সম্রাট, ইহা কি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের মহামূল্য মাণিকের জ্যোতি কি চমৎকার!)

রমা গঙ্গারামকে অনেক রূপে বুঝাইয়া শেষে বলিলেন,—"এই আমার গহনা পাতি আছে সব নাও, আর আমার টাকাকড়ি যা আছে সব নাও। তুমি কাহাকে কিছু না বলিয়া, মুসলমানের কাছে যাও. বল গিয়া যে, আমরা রাজ্য ছাড়িয়া দিতেছি, নগর তোমাদের ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা কাহাকেও প্রাণে মারিবে না, কেবল এই কথায় স্বীকার কর। যদি তাহারা রাজি হয় তবে, নগর তোমার হাতে, তুমি তাঁদের গোপনে কেল্লায় দখল দাও, সকলে বাঁচিয়া যাইবে। রমা গঙ্গারামের সহিত পিত্রালয়ে যাইবার ভাণে পলায়ন করিতেও চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক বুদ্ধিমতি রমার উদ্দেশ্য এই ছিল।—'হিন্দুরাজ্য রক্ষা করিতে, ও প্রজাপুঞ্জের

প্রাণ বাঁচাইতে যদি 'আমাকে সীতারামের সেবা ত্যাগ করিয়া গঙ্গারামের সেবা করিতে হয়, তাহাতে যে পরিমাণ পাপ করিব ; এই লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সতীত্ব সহ প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে তাহার, লক্ষাধিক পুণ্যার্জ্জন করিতে পারিব সন্দেহ নাই।' রমার চিন্তাটার ভাল-মন্দের বিচার পাঠক করিয়া লইবেন। নভেল ঠাকুর, মুসলমানদের পরাজয় এবং হিন্দুদের জয় দেখাইবার জন্য, একটা কাল্পনিক যুদ্ধ সৃষ্টি করিবার মানসে রমাকে এই বেশ্যার বেশ পরাইয়াছেন। কিন্তু কল্পনাটি যেন ডাকিনীর চক্ষে চাহিয়া ঠাকুরের কুৎসিত বুদ্ধির প্রমাণ করিতে বসিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ সমাজের এবং দেশের যে কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছে—তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি ? ইহা কি সংবাদপত্র সকলের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে। তাঁহারা কি দেশবাসীর মস্তিষ্কদোষের দিকে চাহিয়া দেখিবেন না ?)

"গঙ্গারাম রমায়, অনেকবার ঐরূপ নিশীথ-সাক্ষাৎ হইল। সীতারামের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুদিন বাকি থাকিতে রমা ঐ সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। গঙ্গারাম রমাকে দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া মুরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আর খবর নাও না কেন ?" মুরলা বলিল—"ছোটরাণীর রোগ কাটিয়াছে।" গঙ্গারাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রোগ ?" মুরলা বলিল,—"তুমি আর জান না বাত্তিকের ব্যামো।" (পাঠক কথাটা তলাইয়া বুঝিবেন। অর্থাৎ তুমি সে রোগের চিকিৎসক, তোমার চিকিৎসায় সে আরোগ্য হইল, আর তুমি জান না ?)

"গঙ্গারাম রমার জন্য পাগল হইয়া পড়িলেন, রমার জন্য তিনি পৃথিবীর সকল পাপই করিতে প্রস্তুত হইলেন।" (যে সীতারাম এই দুরাত্মা গঙ্গারামকে জীবন্ত-গোর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দুরাত্মা এখন সেই সীতারামের সর্ব্বনাশ করিতে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। পাঠক কল্পনা করুন দেখি-এই নরাধমকে কাজিসাহেব কি সামান্য অপরাধের জন্য জীবন্তে গোর দিবার আদেশ করিয়াছিলেন ? বার হাজার স্বর্ণমুদ্রাতেও ইহার প্রাণ রক্ষা করিতে চাহেন নাই কেন ?—এবার বুঝিলেন কি ? এবার বুঝিলেন কি, মুসলমানদের দূরবীক্ষণশক্তি কিরূপ তীক্ষ। তাঁহারা মুখ দেখিয়া লোকের মনের কথা বলিতে পারেন কি না ?)

(নভেল ঠাকুর এখানে গঙ্গারামকে দিয়া, বাঙ্গালীরা যে কিরূপ কৃতঘ্ন, তাহাই দেখাইয়াছেন !) যাহা হউক, রমার কথা শিরোধার্য্য করিয়া, অনেক কৌশলে গঙ্গারাম, ফৌজদার তোরাব খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং একে একে মনের সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, পরিশেষে অনুরোধচ্ছলে বলিলেন,—"আপনি

সৈন্য-সামন্ত লইয়া, মহাম্মদপুরের দুর্গদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেই; আমি অবিলম্বে দুর্গদ্বার খুলিয়া দিব।” তোরাব খাঁ গঙ্গারামের কথায় আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। “তুমি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটে।—কোন পুরস্কারের লোভেই এ কাজ করিতেছ সন্দেহ নাই। কি পুরস্কার তোমার বাঞ্ছিত?” (ঠাকুর এখানে জ্বলন্ত চিত্রে দেখাইতেছেন যে, হিন্দুরা এমন মারাত্মক রাজদ্রোহী যে, অন্য পরের কথা দূরে থাক, নিজ রাজ্যেরও বিদ্রোহী সাজিতে লজ্জিত নহে।)

(এই গঙ্গারাম গোর হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাঁহাতে তোরাব খাঁকে যৎপরোনাস্তি লাজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল। যে হেতু তোরাব খাঁ ইহাকে উত্তমরূপেই চেনেন। তথাপি তোরাব খাঁ (কেবল, ঠাকুরের সম্রাটী কল্পনার অপমান করিতে না পারিয়া এবং গঙ্গারামকে তৎক্ষণাৎ রজ্জু বন্ধন না করিয়া, তাহার কথাগুলি বিশ্বাস করিয়া লইলেন।) ধন্য ঠাকুর! আপনার বীর কল্পনাকে ধন্য! অপনার মত সুকল্পী আর কিছুদিন বাঁচিলে বাঙ্গালীর অস্থি পর্য্যন্ত লোপ পাইত।)

গঙ্গারাম অর্দ্ধেক রাজ্য এবং শ্রীমতী রমাকে পুরস্কারে চাহিলেন। তোরাব তাহাই তাঁহাকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। গঙ্গারাম আনন্দ-বিগলিত-চিত্তে তোরাবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তোরাব খাঁ সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাদলের মধ্যে হিন্দু সৈনাই অধিক। এ যুদ্ধে মুসলমান সেনারই দরকার। পরন্তু তাঁহাকে হিন্দু-সেনা লইয়াই কার্য্য করিতে হইল। (হিন্দুসেনা না হইলে রাজদ্রোহী হইবে কেন।)

৭ ✻ দেবীদের নগর ভ্রমণ। ✻ ৭

নভেল ঠাকুর বলিতেছেন, জয়ন্তী এবং শ্রী আসিয়া তোপ-গোলা লইয়া মোমেন-সৈন্যপূর্ণ নৌকাসমূহ লক্ষ্য করিয়া, কামান দাগিতে থাকে; তাহাতে ফৌজদারী নৌকা সকল জলমগ্ন হইয়া যায়, আর মৃন্ময় কতক সেনা আক্রমণ করিয়া, তাহাদের পরাভূত করেন। পরাজিত মুসলমানেরা, উপায়ান্তর না পাইয়া পলায়ন করে। (এখানে ঠাকুর আর্শলাকে জলে চিৎ করিয়া ফেলিয়া হিন্দুর মানওয়ার Man of war বলিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই রমণীবাহুতে এইরূপ সাহস ও শক্তি ফলান সম্ভবপর হইয়াছে কিনা তাহা কে বিবেচনা করিবে? এরূপ কথা যে বঙ্গের কোন গাঁজাখোরেও ভাঁজিতে পারে না।—যদি দেবী, তবে যুদ্ধ কেন? আর যদি দেবী

না হয়, তবে বল যে, সীতারামের সেনারা রমণী-অধম ভীরু ছিল? আরও এইরূপ বুঝিয়া লইবেন যে, কথনও যদি স্বর্গ হইতে দেবতা-দেবীরা সশরীরে ভূতলে নামিয়া হিন্দুর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবেই তো ইহলোকে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। নচেৎ সে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।—আমরা ঠাকুরের কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। ওরূপ কল্পনার উপর লেখনী ফিরাইতেও লজ্জা করে।—বাঁশপাতা যেমন সৌভাগ্য-বাতাসে পড়িলে আকার্শ দর্শন করে, ঠাকুরও তেমনি সৌভাগ্য বাতাসে পড়িয়া, এরূপ উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি এমন গ্রন্থ অপেক্ষা বটতলার গ্রন্থগুলি এবং আমাদের সোনাভাণ জৈগুনাদি পুথি সকল সহস্র গুণে ভাল।— সুবিজ্ঞ মনস্বীমণ্ডলী-মধ্যে উঁহার গ্রন্থের আদর আছে কি?)

জয়ন্তী শ্রীকে সঙ্গে লইয়া, বিবিধ ছদ্মবেশে, মহাম্মদপুর, ভূষণা এবং নিকট-বর্ত্তী-স্থান সকল দিবা-রজনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তোরাব খাঁয়ের অন্তঃপুরেও যাইতেন। এইরূপ করিয়া তাঁহারা তোরাবের সৈন্য সামন্তের সংখ্যা ও শক্তি নির্ণয় করিলেন। (তোরাব খাঁ এই আকাশ দুহিতাবৎ দেবীদ্বয়কে দুগ্ধ-কলায় সেবা করিতেন না কি?) মহাম্মদপুরের পার্শ্ব দিয়া যে মধুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, একরাত্রি সেই নীরব নদীর কোথায় কতটা জল, সন্তরণপটু দেবীদ্বয় তাহার অবগতি লাভ করিলেন। নদীর মধ্যভাগে এক চর আছে, জুয়ারে তাহা ডুবিয়া যায়। তথন তাহার উপর কত জল হয় তাহাও নির্ণয় করিলেন। মহাম্মদ পুরের বীর সকল, রণভয়ে কিরূপে কাঁপিতেছে, কিরূপে ভাবিতে ভাবিতে মূর্চ্ছাগত হইতেছে, দেবীরা তাহাও জানিয়া লইতে বাকী রাখিলেন না।

ভিতরে ভিতরে সমুদায় কথা অবগত হইয়া, একদা নিশার গভীরে বিজলী উজ্জ্বল ত্রিশূলধারিণীদ্বয়, নগরমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। নিদ্রিত নগরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, গঙ্গারামের ভবন হইতে মুরলা নির্গত হইল। অমনি সেই দেবদৃপ্তরূপরাশিসহ, শিখাপ্রসবী অঙ্গার লোচনা, জ্বলন্ত ত্রিশূলপাণি ভৈরবীমূর্ত্তি-দ্বয়, মুরলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাপে পরিলিপ্তা দুর্ব্বল কলেবরা মুরলা সেই রক্তিমরূপ-প্রলেপিতা দেবীদ্বয়কে দর্শন করিয়া, তাহার আত্মা নদীর যাবতীয় রস বিশুষ্ক প্রায় হইয়া পড়িল। দুর্দ্দম্য উত্রাসে তাহার বদন কান্তি বিবর্ণিত হইয়া গেল। কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া, সেই শুক্রতারাপ্রভ সমুজ্জ্বলা ত্রিশূলধারিণীদ্বয়ের পদমূলে, ধরাশরীরা হইয়া, আস্থাপূর্ণ প্রাণে প্রণাম করিল। তদন্তে কৃতাঞ্জলিপুটে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া অচল প্রতিমাবৎ কাঁপিতে লাগিল।

"জলন্ত নয়না জয়ন্তী, গম্ভীর মেঘনাদী শব্দে উত্রাসবিভাষী-নেত্রপাতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কে ?" মুরলা কাতর বচনে উত্তর করিল,—"মা! আমি ছোট রাণীর দাসী, আমার নাম মুরলা।"

জয়ন্তী আবার সেই শার্দ্দূলদন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতরাত্রে তুই নগরপালের আবাসে কি করিতে আসিয়াছিলি ?" মুরলা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল,—"ছোটরাণী আমাকে পাঠাইয়া ছিলেন।"

সম্মুখেই এক বিরাট দেবমন্দির ছিল। জয়ন্তী মুরলাকে সেই পবিত্র মন্দিরে লইয়া গিয়া, শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করায়, মুরলা সমুদায় গুপ্ত কথাগুলি দেবীদ্বয়ের সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া দিল। পরিশেষে পদপঙ্কজ চুম্বন করিয়া সরোদনে স্বীয় দোষের মার্জ্জনা চাহিল। "মা আমরা আপনার স্নেহ-মায়ার সন্তান, পাপার্জ্জন-জন্য জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যখন আপনাকে বিনা আমাদের উপায়ান্তর নাই, তখন দয়া করিয়া আমাকে, ছোট রাণীকে এবং গঙ্গারামকে স্বীয় অপরিসীম গুণে রক্ষা করুন। (গঙ্গারামের উপর এত দয়া কেন ?) আপনি না করিলে আমা-অভাজনদের লজ্জা আর কে নিবারণ করিবে ?"

জয়ন্তী সেইরূপ ত্রাসপ্রদর্শী স্বরে বলিলেন,—"তুই নিয়ত নিশার গভীরে, এই দেবমন্দিরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবি! এবং যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব যথাযথ বলিবি। ইহা যদি না করিস্ তবে তোর ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিবে।" মুরলা সেই সাক্ষাৎ দেবীদ্বয়ের সকল কথায় প্রতিশ্রুতা হইলে, দেবীরা তাহাকে অব্যাহতি দান করিলেন। (দেবী দেখিলে পতিত-জাতি, কিভাবে কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হয়, আসল ও নকলে প্রভেদ না বুঝিয়া, কিরূপে প্রগাঢ় ভক্তি দেখায়, ঠাকুর এখানে তাহারই এক জলন্ত ছবি দেখাইয়াছেন। আমরাও দেখিতেছি, এজাতি মন্দকেই ভাল এবং ভালকে মন্দ বলিতে অভ্যস্ত। ইহারা যে যে সংবাদপত্রের প্রশংসা করিয়াছে সেই সেই পত্রের (যেমন যুগান্তর, নবযুগ, সোনার ভারত, ধূমকেতু ইত্যাদি) লেখক-দিগের হাতে দড়ি পড়িয়াছে। যাহাকে মন্দ বলিয়াছে (যেমন মেঘনাথবধ কাব্য) তাহা শেষ ভাল দাঁড়াইয়াছে। এজাতির মাথাই অপরূপ।)

মুরলা মুখভরা প্রশংসা লইয়া যেখানে সেখানে গিয়া দেবীদ্বয়ের যশোগান করিতে লাগিল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, নগরলক্ষ্মীদের অক্ষয় কীর্ত্তিরাশির বর্ণন করিয়া পুরবাসিনীদের স্তম্ভিতা ও বিস্ময়াপন্না করিয়া তুলিল। (দেবীরা যেমন করিয়া শূন্যরথে আসিয়া ধরাধামে অবতীর্ণা হইলেন, যেমন করিয়া সেই রথ আবার আকাশ আলো

করিয়া, 'শোঁ শোঁ' রবে উড়িয়া গেল; যেমন করিয়া সহসা মাটি ফাটিয়া মহাদেব নির্গত হইয়া মুরলার হাত ধরিয়া, সেই গুপ্ত কথাগুলি দেবীদের কর্ণগত করাইলেন; যেমন করিয়া আবার নয়নের পলকে সকলেই একত্র অদৃশ্য হইয়া গেলেন; ইত্যাদি।)

পুরবাসিনীরা মনে করিলেন; তাহাদিগকে এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই, স্বয়ং নগরলক্ষ্মী সশরীরে দেখা দিয়াছেন। (ধন্য ঠাকুর! বাঙ্গালী যে কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত জাতি, কিরূপ সরল বিশ্বাসী, এবং কিরূপ অধঃগামী, আপনি তাহার জ্বলন্ত চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছন। বলি ঠাকুর! আপনি হিন্দুদের দেবতা-দেবী, এবং দেবভক্ত মহা পুণ্যবান্ নর-নারীদের দেখিলে ঐরূপে টিট্‌কার ছাড়িতে থাকেন কেন? সত্য সত্যই কি হিন্দুরা লম্পট-লম্পটী না দেখিলে, দেবতা-দেবী বলিয়া ভক্তি করেন না? আপনার গ্রন্থের প্রতি ছত্র তাহা ব্যক্ত করিলেও আমাদের বিশ্বাস হয় না কেন? ঠাকুর, আপনি নিজে যেমন হিংসুক, পাঠকদিগকে সেইরূপ হিংসুক করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, আপনি ঐ দুষ্কলী হিংসুক সকলের সম্রাট। উহাদের মাথায় যে সকল দুর্গন্ধ গোবর ভরিয়া দিয়াছেন, যেদিন উহারা সে গোবরে দর্শন পাইবে, সেইদিন আপনিও সিংহাসনচ্যুত হইবেন তাহা স্থির নিশ্চয়।)

"দেবীদ্বয় মুরলাকে ছাড়িয়া দিয়া, নগর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পথে কয়েকজন নগররক্ষী-নগরবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সকলেই দেবীদ্বয়কে নগরলক্ষ্মী মনে করিয়া ধরাশায়ী হইয়া প্রণাম করিলেন।" (পাঠক, সেই উড়েরা যদি ম্যাড়া হয়, তবে এরা কি হইবে? অনুমান করিতে পারেন কি?)

এই নিশীথ রজনীতে চন্দ্রচূড় ঠাকুরও নগর দর্শনে নির্গত হইয়াছিলেন। তিনিও এই দেবীদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারও ভ্রান্তিমান অন্তঃকরণ, ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া গেল। তিনি দেবীদের পুষ্পপ্রভ-পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, যুক্তকরে নিবেদন করিলেন,—"মা! আমি অনুমান করি আপনারাই এই নগরলক্ষ্মী।—এক্ষণে আপনার সন্তানেরা বড়ই বিপদাপন্ন হইয়াছে; এ সময়ে আপনি কোল না দিলে এ সন্তানেরা যাইবে কোথা? (নগরবাসীরা যে কিরূপ ভীত হইয়াছিল, এই দেবীকে দিয়া নভেল ঠাকুর উত্তমরূপে তাহার প্রমাণ করিয়াছেন।)

জয়ন্তী তাঁহার শ্বেতবাহু উত্থিত করিয়া, স্নেহরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক, সহাস্যবদনে ব্যক্ত করিলেন,—"সে চিন্তা তোমরা করিবে কেন?—যদি কখনও সেরূপ দুর্দ্দিন দেখ, তবে তখনি নগর তোরণ অবরুদ্ধ করিয়া, সকলে ছাদে চড়িবে; এবং সেই উচ্চাসনে বসিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে দেখিতে থাকিবে, তোমাদের এই মাতা—কি

মহা ক্ষমতায়, সেদিন তোমাদিগকে রক্ষা করিয়া লয়।" এইরূপ আরও অনেক কথা চন্দ্রচুড়ের সহিত হইল। তারপর, গঙ্গারাম-রমা সম্বন্ধীয় গুপ্ত প্রণয়ের অতৃপ্ত কথা গুলিও, দেবীদ্বয় চন্দ্রচুড়ের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া চন্দ্রচুড় ঠাকুর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন;—"মা, আমি গঙ্গারামকে এতদূর বিশ্বাস করি যে, যদি নগরের সমুদায় লোক আমার নিকট আসিয়া, তাহার অবিশ্বাসিতার কথা আমাকে শোনাইত, আমি কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতাম না। আপনার মুখে শুনিয়া সত্যাসত্যই স্তম্ভিত হইলাম।" জয়ন্তী বলিলেন,—"তোরাব খাঁ নগর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছ কি? সে কার্য্যও ঐ দুষ্ট গঙ্গারাম করিতেছে। কল্য প্রভাতে চাঁদশার মুখে সবিস্তার শুনিতে পাইবে।" এইরূপ বিস্তর কথোপকথনের পর দেবীরা তথা হইতে প্রস্থান্ করিলেন।

গঙ্গারাম তাঁহার দুর্গে বসিয়া, দেবীদ্বয়কে দেখিয়াছিলেন, মুরলার সহিত যে সকল কথা হইল তাহাও শুনিয়াছিলেন, চন্দ্রচুড় এবং আর আর নগরবাসীরা, দেবীকে যেরূপে সম্মান দান করিল তাহাও দেখিয়াছিলেন,তিনি ঐরূপ দেবীদের প্রসাদেই প্রতিপালিত বলিয়া, আজীবন বিবাহ করেন নাই। তিনি দেবীদ্বয়কে লইয়া প্রাণ পুলকিত করিবার মানসে, কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া, রাজপথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন দেবীরা তাঁহার সম্মুখ দিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে উপহাসচ্ছলে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনারা নাকি নগর রক্ষা করিবেন?—তা' আসুন, তোপ-গোলা/সৈন্য-সামন্ত যাহা যাহা চাই আমার নিকট পাবেন!—আপনারা অবশ্যই পাশপাওয়া দেবী হইবেন।"

শ্রী, সকল স্থলেই নীরব, তাঁহাকে গঙ্গারাম চিনিতে পারিলেন না। জয়ন্তী উত্তর করিলেন,—"এখন রাখিয়া দাও, বিশ্বাসঘাতককে বধ করিবার সময় কাজে দেখিবে।" গঙ্গারামের ঘুর্ণিত নয়নদ্বয়, শ্রীর সরস যৌবন এবং রূপরাশির দিকে আকৃষ্ট হইল, তিনি বলিলেন;—"আপনাকেই যেন নগরলক্ষ্মী বলিয়া প্রতীতি হয়,—সঙ্গিনীটি কে?" জয়ন্তী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি তোমার মা, ইনি তোমার ভগিনী।"

গঙ্গারাম বলিলেন,—"তবে, ভগিনীকে ভাইয়ের বাড়ী রাখিয়া যান না—অনেক দিনের পর দেখা সাক্ষাৎ, দুদিন সুখ-দুঃখের আলাপ করি।" জয়ন্তী শ্রীর দিকে রহস্যপ্রভাসী স্বরে কহিলেন,—"কি বল, ভাইয়ের বাড়ী থাকবে? আমার সঙ্গে কতকাল অনাহারা ভ্রমণ করিবে, দুদিন ভাইয়ের বাড়ী থাকিয়া প্রবল ক্ষুৎ-পিপাসার

জ্বালা নিবৃত্ত কর না কেন ?” শ্রী লজ্জায় অবনত মস্তক হইলেন। গঙ্গারাম বলিলেন,—“থাক না কেন, সন্ন্যাসিনীর ভোগোপযোগী সামগ্রীও আমার নিকট দুর্লভ নহে। দুগ্ধবতী গাভী আছে এবং বাগানের মর্ত্তমান কদলী—” শ্রী আর তথায় দাঁড়াইলেন না, অগ্রসর হইলেন; যুবতী শ্রীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া গঙ্গারামকে বলিলেন,—“ভগিনী যদি তাইয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে,—আমি কি করিব—চলিলাম।” এই বলিয়া পাপাত্মা দেবীদ্বয় নগর হইতে অপসারিতা হইলেন।

৮ ❋ পাশের অসীম শক্তি ❋ ৮

হোসেনী ছন্দ।

(কেবল যতি চিহ্নের স্থলে অর্দ্ধ সেকেণ্ড বিরাম দিয়া পড়িলে, এ ছন্দ দ্রুতবেগে পড়িলেও কোন স্থলে বাধিবে না। এবং রসনায় মধু ঝরিবে।)

পড়েছে বিষম সাড়া মহাম্মদপুরে,কেঁপেছে নগরবাসী; দলে দলে নরনারী দৌড়িছে চৌদিকে; কাঁদিছে অবলাদল ঘোর কোলাহলে। ব্যস্ত-চিত্তে দড়বড়ি, কত চড়িতেছে ছাদে, কত তরুশিরে; প্রাচীরে বসেছে কেহ মন্দির চূড়ায়। মহিলা মহলে হিয়া কাঁপিছে সবার, পড়েছে সদরে খিল। অরি ভয়ে রুদ্ধি বদ্ধ নগর “তোরণ,” কোটা-বদ্ধ-নথ যথা, বসিয়াছে হিন্দুকুল বিবর-বিবরে ; আজি তাহাদের তরে, হিন্দু ভয়ঙ্কর। নদীর সুদূর পারে দেখেছে তাহারা, ভীমকায় এক মহা রাহু ভয়ঙ্কর। একই গরাসে সেই দুরন্ত রাক্ষস, নির্গ্রাসিবে এ নগর একই নিশ্বাসে। কে আছে তেমন বীর হিন্দুকুল মাঝে, এ অরি তোরাবে দলি রক্ষিবে নগর। নদীবক্ষ পানে অক্ষি রাখি প্রতিক্ষায়, রয়েছে চাহিয়া সবে ভয়ার্ত্ত চোখে; মেষদল যাহা যেন দেখেছে শার্দ্দূল। নদীর নিকটবর্ত্তী একটি চূড়ায়, দাঁড়ায়েছে চন্দ্রচূড়, আর কতিপয় বীর মৃন্ময় তাহাতে। নয়নে ভয়াশ্রু ঝরে মৌখিক সাহসে, গাহিছে দেবীর স্তুতি ; রমণী-অধম যত ভীরু কাপুরুষ। তাদের পশ্চাতে, গাহিছে নগরবাসী ; গুরুর প্রহৃত ছাত্র, যেন দল বাঁধি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সবে পড়িতেছে ‘ডাক’।

না চলে পান্‌সী, ডিঙ্গা, বজরা তরণী, জনশূন্য প্রায় প্রতি গঙ্গার পুলিন; একটি হিল্লোল নাই, স্রোতস্বতী মধুমতী গভীর নীরব। একটি রমণী, না নামে কলসী কাঁকে নদীর সোপানে, না করে সলিল কেলী ; একটি মানুষ নাই নদীর গরভে, একটি

ধীবর মাঝি ; যে যেখানে সে সেখানে এঁটেছে কপাট। পথেতে পথিক নাই জনতা বিহীন, সিন্দূর বরণা বামা, অন্তিম শয্যায় যেন, ধুলার বিছানা পাতি শুয়েছে নীরব। তরুরাজি আর, প্রতিপার্শ্বে স্বন স্বনে কাঁদে অনিবার।

সুদূর নদীর পারে, ঐ শোভে গায়ে গায়ে গৃহচূড়াচয়, [illegible]ইয়া বেলফুল, নর-নারী যত তারা বসেছে তথায়। আর সে পুলিনে, ঐ ইনিঝি[illegible] কয়ে সেনা তোরাবের। পাঁচ শত বীর তথা সাজি রণসাজে, অর্দ্ধশত তরীপরে আরোহে আমোদে, উৎক্রোশ [illegible]ধ্বনি করে জনে জনে।—ঐ বীরদলে হেরি, এ পারে পড়েছে এই শোকের উচ্ছ্বাস। এ পারে উতরি যবে, বেড়ি দাঁড়াইবে ওঁরা মহাম্মদপুর, কার হেন সাধ্য সে যে আঁটিবে ওঁদের ?—ঐ রাক্ষসের ভয়ে এই বীরদল, তোরণে অর্গল দিয়া বসেছে বিরলে। তোরাবের ভয়ে, জীবন্তে সকলে গোরে করেছে প্রবেশ। একটি পরাণী কিংবা জন্তু কোনরূপ, ঐ যমভয়ে নাহি বিচরে বাহিরে।

প্রস্তর সোপানে তুমি, ঐ যে দেখিছ ছুটি রমণী মুরতী, প্রভাত নক্ষত্রবৎ উজ্জ্বল-বরণী ; ঐ দেবীদ্বয়, করিবেন আজি ঐ অরি পরাজয়। সেদিকে মোমেন সৈন্য তরী আরোহিয়া, দাগিলা সালামী তোপ ; গর্জ্জনে যাহার, কাঁপিল সুনীল অম্বু, কাঁপিল অম্বর। আর কত মূর্চ্ছাগত, হইল বীরের দল, মহাম্মদপুরে। কামান গর্জ্জন সহ ডুইটি কুসুম, আচম্বিতে অম্বু মাঝে উঠিল ফুটিয়া। ভীম কলেবরা ফুল, উজ্জ্বল করিল জল আলোকি চৌদিক, ধাঁধিল নয়ন তায় দূর-দর্শকের।—হেরি অপরূপ দৃশ্য, মানিল বিস্ময় সবে সেনা তোপাবের, হইল অবাক তারা লাগিল কহিতে—"এমন যুগল-ফুল, কোথা হতে কিপ্রকারে ফুটিল সলিলে !"

আদেশিতে মাঝিগণ ছাড়িল তরণী, চলিল মহাম্মদপুর উচ্চ কোলাহলে। তা'সহ কুসুমদ্বয়, মুখামুখী হয়ে,চলিল চঞ্চলগতি দেবীদের আগে। নীরব নদীর বক্ষে সে বারি বিস্তারে, হেরি এ ভৌতিক লীলা দৃশ্য অপরূপ, হইল অবাক সবে, কোনই চিন্তায় ভেদ নারিল নির্ণিতে। অর্দ্ধপথে যবে তরী, পৌছিল কুসুমদ্বয় দেবীশোভি-ঘাটে। সে কুসুমে আরোহণ করিলে তাঁহারা, চলিল আবার ফুল, আসিল যে পথে। আপৃষ্ঠ লম্বিত কেশ শিরেতে কিরীট, গৈরিক বসনা দুটি রুদ্রাক্ষ ভূষণা, শোভিল উজলি জল, লক্ষ্মী-সরস্বতী যেন, ফুটন্ত কুমুদে বসি চলিলা ভাসিয়া। চৌদিকে দর্শক যত, এ দৃশ্য দেখিয়া সবে স্তম্ভিত, অবাক !

বিজলী বদনা বামা, নানা ভঙ্গিমায়, চলেছে জয়ন্তী দেবী; শ্রী—দাঁড়াইছে পুষ্পে প্রতিমা সোণার ; জয়ন্তী সুন্দরী, কভু লুকাইছে ফুলে, কভু সে আবার, দাঁড়াইছে

সশরীরে পুষ্পের উপর। নদীর চৌদিকে, উঠিয়াছে ছাদে ছাদে ঘোর কোলাহল, গাহিছে দেবীর জয়, 'চড়বড়ে' করতালি পড়িছে কেবল, চীৎকারিছে মহোৎক্রোশে প্রকাশি উল্লাস। কেহ বলে লক্ষ্মী কেহ সরস্বতী দেবী, কেহবা ভৈরবী বলি ভাবে জয়ন্তীরে; কেহ রাধাকৃষ্ণ কেহ বলে সে কমলা। জ্ঞানোপহা দৃশ্যাবলী নিরখি সকলে, হয়েছে প্রতিমাবৎ, উল্লাসে মাতিয়া মাত্র করিছে চীৎকার। ফৌজদারী মাঝিদল নামায়েছে পাল, না চাহে বাহিতে তরী, বলিছে তাহারা, "দেবীদের সাথে মোরা নারিব যুঝিতে।" এই বলি দেবীদ্বয়ে, যত হিন্দুসেনা তারা করিল প্রণাম; গঙ্গাজল তুলি করে, উচ্চঃস্বরে জিজ্ঞাসিলা দেবীদিগে স্মরি। "কহ মাতা! কি আদেশ, পালিতে প্রস্তুত মোরা সন্তান তোমার।" আদেশ করিলা দেবী, বীণাকণ্ঠ তাঁর, বাজিয়া উঠিল যেন সুনীল সলিলে। "দেবতার সাথে বাদ না সাধ তোমরা, এই উপদেশ আমি দিই তোমা সবা।—ঐ দেখ মেঘতলে, দিতেছে কি উপদেশ দেবতা স্বর্গের।—'এতদিনে এই দেশ হইবে হিন্দুর, না হও বিরুদ্ধাচারী।"

মায়ের আদেশ পেয়ে যত হিন্দু তারা, চাহিল মেঘের দিকে, দেখিল সেখানে, মায়ের বিস্তর সেনা রয়েছে লুকায়ে। সেই দৃশ্য মনোহর, দেখিল বিস্তর লোক, না দেখিয়া কত লোক কহিল 'দেখেছি।' ভাবিল অনেকে আর—'না হইলে পুণ্যবান, দেবতার দরশন ঘটে কি কপালে?' আবার আবার কেহ দেখিল চাক্ষুষ—দেবীদের আঁখি দিয়া, ছুটিছে বিজলীরাশি পশিছে আকাশ।—কেহ বা দেখিল তথা দূর তরুশিরে, বসিছে বিস্তর দেবী, হইল অদৃশ্য তারা আঁখির পলকে। কেহবা দেখিয়া নিজে, দেখাইল সঙ্গীদলে কৌতুকে মাতিয়া।—'ঐ দেখ আশুগতি! এই দেবীদের মত শত শত দেবী—ঐ যে সুদূরে যেথা বাঁক এ নদীর, ঝলিছে রজত জল, ঐ দেশে সেতু এক, আহা মরি কি সুন্দর দেখিনু নয়নে,—দেখিনু নয়নে আমি কোন পুণ্যবলে, একযোগে জল ঠেলি, রজঃরেখাবৎ, ভাসিল বিশাল জলে পরিদল প্রায়, নিমিষে বাঁধিল সেতু, নিমিষে আবার, হইল অদৃশ্য সবে পশিল সলিলে।' এইরূপ শত শত দৃশ্য অপরূপ, দেখিতে লাগিল যত দুগ্ধকল্পী তারা।

না ভাব পাঠক তুমি, ঠকাতে লেখক তোমা ছলিছে এরূপে! 'এই দেবীদ্বয় ছাড়া সেই পাঁড়েদল, না দেখিল অন্য কিছু।'—নাহি জান তুমি! ভয়ত্রস্তজন যবে পড়ে অন্ধকারে, দেখে ভূত-পেত্নী কত ডাকিনী বিকট, আর ভাবে ভূত সেই ছায়ারে আপন। তালবৃক্ষসম প্রেত দেখে সে সম্মুখে। ভূতের রোদন শোনে, শুষ্ক তালপত্র যবে স্বনে সমীরণে। তেমনি জানিও, সরল বিশ্বাসী ঐ হিন্দুপাঁড়ে

দল, হেরিতেছে জনে জনে ভাঁড়োতে ভবানী। বুদ্ধির ভাণ্ডারে যার সত্যজ্ঞান নাই, না দেখিবে কেন সেই এরূপ খেয়াল ?”

সেনাপতি পীরবক্স, হিন্দুদের মতি-গতি হেরি অপরূপ, জ্বলিল বিষম রোষে, মাঝিদলে বীরবলে করিলা প্রহার, “চালাও এখনি তরী। হেরিয়া পিশাচ, দেবীবলি মনখুলি করিস বিশ্বাস, অপরূপ লোক তোরা জন্মিলি জগতে! দেখেছি ওদের আমি, আরোহি নাচিতে এক মহীরুহ শাখে। যা পারে করিতে ওরা করিবে আমার, চালাও সত্বর তরী;—মহাম্মদপুর. এখনি করিতে জয় হইবে আমায়।”

কহিল মাঝির দল ডরিয়া অন্তরে, “ঐ দেখ দেবীদ্বয়, নিশেধে সুচারু ভুজ করি সঞ্চালন! দেবীর অমতে তরী নারি চালাইতে।” এই বলি মাঝি যত, শুইয়া নৌকায় সবে গড়াগড়ি দিয়া, দেখাইল মাতৃভক্তি নমি ঘন ঘন।

কুৎসিত ভাষায় নিন্দা করি দেবীদের, বীরবলে পীরবক্স, আরম্ভিলা পীড়াপীড়ি ঘোর অত্যাচার। চাবুকে চিবুক কত দিল ফাটাইয়া, বহাইল কত পৃষ্ঠে ধারা শোণিতের; ভাঙ্গিল কতই হাঁড়ী, দিল ভাসাইয়া জলে বাসন. সকল।—চুল্লির পারশে বসি মাঝি একজন, ভাজিতে আছিল লঙ্কা ফেলিয়া খোলায়; তার সে খোলায়, রোষপরবশে বীর মারিলেন ছড়ি। ভাঙ্গিল সে খোলা, লঙ্কা পড়িল চুলায়, নিষ্কাসিল বিষধূম। তালে তালে সেই ধূম, প্রবেশিল নাসিকায় সে পীরবক্সের; কাপাইল বীরবরে করিল অস্থির; কাঁদাইল নাকে-মুখে, বসিয়া পড়িল শূর ঘোর উচ্চ কাশে। মাঝিসহ বীরদল, সে তরীর জনে জনে কাশিল অস্থির; প্রবল কাশিতে বাধি করি হুড়াহুড়ি, জড়াজড়ি করি সবে পড়িল সলিলে; কতিপয় লোক তায় মরিল ডুবিয়া। শবদল মাঝে, সেনাপতি পীরবক্স ছিল একজন। দেবীদের অভিসাঁপে মরিল তাহারা, বিশ্বাসিলা পাঁড়ে দল, আর বিশ্বাসিলা যত দূরের দর্শক।

সেথানে মোমেন-সেনা স্বল্পসংখ্য তারা, হইল হিন্দুর প্রতি জ্বলন্ত অঙ্গার। যা কিছু ঘটিল, ভাবিল ধৃষ্টতা হেতু হইল হিন্দুর। হিন্দুরা ভাবিল তাহা শাপ দেবীদের, কথায় বাড়িল কথা, প্রতিপক্ষ অনলাক্ষ, করিলেক পরস্পরে দক্ষ আক্রমণ। সে গৃহ বিচ্ছেদে, মরিল বিস্তর লোক মোমেন দলের। হারিল মোমেনগণ স্বল্পসংখ্য হেতু, তরী ফিরাইয়া তারা করে পলায়ন।—প্রকাশি উৎক্রোশরাশি হিন্দুদল যত, বিঘোষিলা জয়ধ্বনি হিন্দু দেবীদের।—নীলজলরাশি পরে ভাসিত কুসুমে, সুহাসিনী দেবীদ্বয়, খুলি সুর-দৃশ্যচয় শ্বেতভুজ তুলি, হেলায়ে দুলায়ে বাহু নাচিয়া নাচিয়া, ছলিলা তরঙ্গিদলে, লাগিলা বলিতে আর সজীব বচনে,—“এ যবনরাজ্য এবে হইবে হিন্দুর,

না রবে যবন দেশে। মীমাংসিল এই কথা, দেবকুল বসি তথা অম্বর-সভায়। বীর করে ধরি অসি, গাও হিন্দুদের জয় অক্ষয় বচনে।"

আশামুখী ভাষা শুনি হিন্দু পাঁড়েদল, তরীতে শরীর পাতি, স্মরি দেবীদ্বয়ে সবে করিলা প্রণাম। ছিলা নর-নারী যত চৌদিকে চূড়ায়, তাহারাও ভক্তিছন্দে নমে দেবীদের। চারিদিকে জয়ধ্বনি আনন্দ নিনাদ, ঘোর কোলাহলে তথা, পূরিল সলিল রাশি পূরিল আকাশ, রাখাল দেখিল যেন রাজ্যের স্বপন।—'হইবে হিন্দুর রাজ্য, সে মধু বারতা, পশিতে হিন্দুর কাণে জনে জনে তারা রচিতে লাগিল দুর্গ সুনীল অম্বরে। লইল গণিয়া আর, সমগ্র ভারত হবে ক'দিনে হিন্দুর।

এইরূপে রণজয় করি দেবীদ্বয়, সোণার প্রতিমা তারা, উদ্ভাসিত রূপরশ্মি ছড়ায়ে সলিলে, ভাসায়ে জলজফুল, মহাম্মদপুর পানে চলিলা হরষে। 'চড়বড়ি' করতালি, চূড়ায় চূড়ায়, পড়িল, তা' সহ কত; বিদায়ী প্রণাম কত কে পারে গণিতে। চিত্তবিনোদন গান মধুকণ্ঠী যত, আরম্ভিলা বীণাস্বরে, আনন্দে পূরিল দেশ সে মধু নিনাদে। মধুমতী স্রোতস্বতী নাচিলা উল্লাসে।

মহাম্মদপুরে তথা, গোরগত নর-নারী অপোগণ্ড যত; ভাসিলা উল্লাসে যেন হেরিলা স্বরগ। মহোৎক্রোশে মাতি তাঁরা, ফাটাইয়া হৃদপিণ্ড ছাড়িলা হুঙ্কার। চূড়ানর্তে সমর যথা পুরুষের দল, আবাসে আনন্দ করে নারী তাহাদের; ইহারাও নারীপ্রায় দেবীদের জয়ে, নাচাচ্ছে অযুত নাচ উন্মাদ আকারে। কতক্ষণ নাচি তবে ছাদ হতে অবতরি' আইলা ভূতলে, শোভিলা বিরাট মাঠে, গাহিলা দেবীর জয় ঘোর কোলাহলে।

দেবীর কুসুম-যান, দু'কূল হাসায়ে যবে তর তর তরে, আসি উপাজল ঘাটে, দেবীদ্বয় মধুহাস নামিলা সোপানে। অমনি সে পুষ্পযান তর তর তরে, আপনি ভাসিয়া গেল নদীর ডহরে। বহুদূর গিয়া, অসংখ্য মানব নেত্র যাদু ফুৎকারিয়া, ডুবিল যুগলফুল অগাধ সলিলে। নগরে গভীর গোল, শুনিলা সে দেবীদ্বয় দাঁড়ায়ে সোপানে, কিন্তু না হেরিলা, জনপ্রাণী মাত্র কারে নগর বাহিরে। চিন্তিলা তবেন তাঁরা, নিশ্চয় নগরবাসী, প্রাণপণে পালিয়াছে আদেশ তাঁদের। নিরাতঙ্ক ভাবে তাহ, যত গুপ্তকাজ দোঁহে লাগিলা সারিতে।

জনশূন্য সে সোপানে, থুইলা ত্রিশূল আদি গৈরিক বসন, দু'টি দেবী কুতূহলে নামিলা সলিলে। সন্তরণ দিলা কত, যাইয়া অগাধ জলে ডুবিলা কৌতুকে। এইরূপে ইহাদের করি জলকেলি, খেল কতরূপ খেলা, আবার শোভন আসি রজত সোপানে। জনশূন্য সেই দেশে, লাজ করিবার কোন না ছিল কারণ, ছাড়িল

বসন তারা বিনা সাবধানে; মাখিলা গৈরিক মুখে লইলা ত্রিশূল, যাইতে নগর পানে হইলা প্রস্তুত।—সহসা ফিরাতে আঁখি সাতঙ্কে হেরিলা তাঁরা সোপানের পারে, বসিছে পুরুষ এক তরু অন্তরালে।—তা' দেখি সন্দেহ মনে উদিল অনেক, থমকি অমনি তাঁরা দাঁড়াইল তথা, সে জনে চিনিল শ্রী কহিল অমনি,—"ইনিই আমার স্বামী—রাজা নগরের, এইমাত্র বুঝি, ফিরেছেন দিল্লী হ'তে। অবরুদ্ধ এ নগরে নারি প্রবেশিতে, বসি ছেন এই হবে আসি তরুতলে।"

সিহরে জয়ন্তী শুনি কহে ধীরস্বরে,—"ছাড়িনু বসন যবে, তাই ভাবি মনে, পড়িল কি আমা'পরে দৃষ্টি এ জনের?" উত্তর করিলা শ্রী,—"কেমনে জানিব বল,—তুমি তো দক্ষিণমুখী ছাড়িলে বসন, উত্তরে বসিয়া উনি দেখিবে কেমনে? দেখে যদি থাকে ভাই দেখেছে আমায়। মরি আমি লাজে তাই স্মরি সেই কথা।"

হাসিলা জয়ন্তী দেবী। "দেখিতে চোখের দেখা, তা'তেও কি অধিকার নাহি ও জনার?" গম্ভীর বচনে শ্রী, করিলা উত্তর,—"কেন রবে অধিকার, কোন্ অধিকার উনি দিয়াছে আমায়?—নন্দা, রমা হয় রাণী এ রাজ্যে আমার, কহ তো জয়ন্তী তুমি, সে কথা স্মরিলে, কিরূপে বিদরি চূর্ণ হয় এ মরম?"

কহিলা জয়ন্তী হাসি,—"এইবার রাণী তুমি হইও আপনি, নন্দারে বিদায় দিও, রমারে করিয়া ভাজ রাখিও নিকটে।—তা'হলে তো মনসাধ পুরিবে তোমার?" কহিলা উত্তরে শ্রী,—"পুরাইতে পার যদি তবে না পুরিবে। নহে এ স্বপ্নের ফুল, দেখাইছি যেইরূপে হিন্দু সবাকারে, আমরাও সেইরূপ দেখিব কহিনু।"

কহিলা জয়ন্তী,—"অবশ্য পুরিবে সাধ, এই হেতু মোরা, সাধারণ পরিশ্রম করিনু স্বীকার? এত পরিশ্রম, বিফল হইবে তুমি কভু নাহি ভাব।—যতটুকু ফন্দী চাহি হিন্দু ভুলাইতে, তা'হতে সহস্র গুণ, শিখিয়া সুন্দর ফন্দী নেমেছি এ কাজে।—এস তুমি চল সাথে, কিন্তু সাবধান তোমা না পারে চিনিতে।" এতেক কহিয়া তাঁরে লইয়া পশ্চাতে, চলিলা জয়ন্তী দেবী অবনত মুখে।

যেরূপে এ দেবীদ্বয়, আকাশ সম্ভব এক দৃশ্য মনোহর, খুলি এ ভুবন ভরী মানবের চোখে, রাখে মহাম্মদ পুর; সীতারাম সমুদায় দেখেছে নয়নে। ইহারা সাক্ষাৎ দেবী, সাপেক্ষ তাঁহার, এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী, তাহাতে সন্দেহ আর না ছিল তাঁহার। মা তৃজ্ঞানে তাই তিনি, যখন সে দেবীদ্বয়, আছিলেন জলে, না হেরিল সেই দিকে। মুদিত নয়নে, বসি ছিলা তরুতলে তিনি আপন চিন্তায়। অসৎ পুরুষ প্রায়, দেবীদের স্নানকালে যদি সীতারাম, রাখিতেন চোরা-চোখ তাঁহাদের পরে;

সে দশায় কোন এক কাণ্ড বিপরীত, ঘটিত সে স্বর্ণ ঘাটে কহিনু নিশ্চয়, দেবীগিরী জয়ন্তীর ঘুঁচিত তখনি।—সেই চিন্তা, উদেছিল জয়ন্তীর মনে।

উজ্বলি বিজলী রূপে, চলিয়াছে দেবীদ্বয় নগরের পানে। অমনি সে সীতারাম, আলম্বি সুলম্ব দেহ পড়িয়া ধূলায়, চুমিলা সে দেবীদের চারিটি চরণ। জানুপাতি তবে তিনি বসি পাদদেশে, কহিলেন করপুটে,—"কি পুণ্য করিনু মাতা, তাই এ পুত্রের প্রতি কৃপা এতাধিক!—দেহ পদ ধূলি মাতা এ দাসের শিরে।"

মস্তকে চরণ তুলি জয়ন্তী রূপসী, আশীষিলা সীতারামে; আদেশিলা আর তাঁরে, আকার ইঙ্গিতে, লইবারে আশীর্ব্বাদ সঙ্গিনী তাঁর।—সে দিকে সে শ্রী অপারগ সেই কাজে দাঁড়াইছে দূরে।—না ছাড়িল সীতারাম, যুগল চরণ তাঁর ধরিল অমনি। "কেন মা আপনি, নাহি দেন আশীর্ব্বাদ পুত্রে আপনার।" এই বলি পায়ে শির লাগিল ঘষিতে, কিছুতে না ছাড়ে আর সে চারু চরণ। বিষম বিবন্ধে পড়ি, অগত্যা সে শ্রী তাঁরে করি আশীর্ব্বাদ, দিলা পদধূলি তুলি মস্তকে চরণ; কহিলা প্রদমি হাস;—"উঠ বৎস মনঃ আশা পূরিবে তোমার, করিও মায়ের ভক্তি।"

আনন্দে উৎফুল্ল অতি ধূসরিত ধূলে, উঠিলেন সীতারাম, চলিলেন দেবীদের লইয়া পশ্চাৎ। কহিলেন গতি পথে; "আসিতেছি দিল্লীহতে, এইমাত্র মাগো আমি ক্লান্ত অতিশয়। নগর তোরণে গিয়া, অবরুদ্ধ প্রতি দ্বার পাইনু পরিশে, চেষ্টিনু অশেষরূপে, কিন্তু কোনজন, না দিল খুলিয়া দ্বার আমার সম্মুখে।—না পারি বুঝিতে, প্রজাগণ অসন্তুষ্ট কেন আমাপরে।" কহিল জয়ন্তী শুনি। "না হেরি ত্রিশূল, কভু না খুলিবে দ্বার আদেশ আমার।" জিজ্ঞাসিলা সীতারাম বিনয় বচনে;—"কহ মাতা দয়া করি, নগরের গুপ্তকথা শুনি তব মুখে।"

কহিলা জয়ন্তী দেবী, একে একে যত কথা জানিত রমার, আর যেই ষড়যন্ত্র করি গঙ্গারাম, এ বিপ্লব ভয়ানক আনে এ নগরে।—এইরূপ মিলি তাঁরা কথায় কথায়, আসি উপজিল তথা নগর তোরণে। জয়ন্তী অমনি, তুলিয়া ধরিল তাঁর বিজলী ত্রিশূল। তা' দেখে নগরবাসী, অশনি নিনাদে দ্বার দিলেন খুলিয়া। দাড়িম্ব ফাটিল যেন দানার আকর। লোকের অরণ্য প্রায়, পশিয়া ভিতরে তাঁরা দেখিল সম্মুখে।—পাশাপাশি ঠাঁসাঠাসি, গিয়াছে ভরিয়া নরে মাঠ নগরের। দেবীদের আগমনে অমনি সকলে, হইলা ভূতলশায়ী; শোভিল পলকে, সন্ধ্যার সমরক্ষেত্র দেবীর সম্মুখে। রাশিরাশি স্তূপে স্তূপে পড়িল তথায়, কে কাহার বুক-পিঠে, উপরি উপরি কত কে পারে গণিতে।—দেবী দরশনে সবে আনন্দে বিভোর, হইয়াছে

জ্ঞানহারা। কি তারা করিছে, তাহা না জানে কিছুই ; স্বরগে মরতে কিবা আছে কোন দেশে, না পায় চিন্তিয়া কেহ।

আতঙ্কিলা দেবীদ্বয়, সে জনতা হেরি, দ্বারপার্শ্বে দেবালয়ে পশি লুকাইলা। সেই উচ্চাসন হতে, কহিতে লাগিল দেবী সম্বোধি সকলে। "রবে না যবন আর, হিন্দুর অজেয় রাজ্য বসিবে ধরায়, এত দিন পর, চায়েছেন মুখ তুলে দেবতা হিন্দুর। যে যার আবাসে এবে যাও চলি সবে, না রহ এথানে কেহ। সময়ে সময়ে, আসি আমি দিব দেখা তোমা সবাকারে।" এতেক কহিতে দেবী, আঁখির পলকে ভিড় ভাঙ্গে তথাকার, ভাঙ্গে যথা রঙ্গস্থলে অভিনয় শেষে। সেই অবসরে, সুহাসিনী দেবীদ্বয় করিলা প্রস্থান। তারপর মাঝে মাঝে আসিতেন একাকিনী জয়ন্তী সুন্দরী, শ্রীকে তখন তিনি, লুকাইয়া রাখিতেন ভীষণ শ্মশানে। (কেন লুকাতেন তাঁরে, রাজজ্ঞান বিনা তাহা নহে বুঝিবার।)

৯ ❋ সনন্দ প্রাপ্ত সীতারাম। ❋ ৯

জয়ন্তীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সন্ধ্যাকালে সীতারাম বাবু, চন্দ্রচূড়ের সম্মুখে বসিয়া, গঙ্গারাম সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন। চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের যাবতীয় অবিশ্বাসিতার কথা, একে একে তাঁহার কর্ণগোচর করাইলেন।—যে রূপে গঙ্গারাম, নিয়ত আহূত হইয়া, নিশার গভীরে ছোটরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ;—যেরূপে শস্তলী শ্রেষ্ঠা অবলা, নিয়ত তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত ;—যেরূপে সেই মুসলমান দ্বারবান তাঁহাকে ছাড়িয়া দিত ;—যে রূপে গঙ্গারাম গোপনে তোরাবখাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, হিন্দুরাজ্য লুটাইয়া দিয়া, তৎফলে রমাকে পাইবার প্রত্যাশা করিয়া ছিল;—আর যেরূপে দেবীদের কৃপায় ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা পাইয়াছে। এই সকল শুনিয়া, সীতারাম গঙ্গারামের উপর অগ্নিশর্ম্মা হইয়া দাঁড়াইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দী করিয়া হাজতে রাখিতে হুকুম করিলেন। (সীতারাম রমাকে হাজতে রাখিলেন না কেন? —পাছে প্রমাণ হয় যে, তাঁহার মাথায় রাজশক্তি ও রাজ বিচার আছে।)

গঙ্গারামকে হাজতে রাখিবার পর, চন্দ্রচূড় সীতারামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দিল্লীর সংবাদ ভাল তো।" সীতারাম বলিলেন,—"সংবাদ শুভ।—মহাম্মদপুর এবং ভূষণা আদি, দ্বাদশ ভূমির মহারাজা পদ পাইয়াছি। সম্রাট এই

সনন্দ পত্র দিয়াছেন।" চন্দ্রচূড় সনন্দ পত্র দেখিলেন। তাঁহার মনে কি এক সন্দেহ হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি বাদশাহকে এই পত্রে স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছিলেন কি?" সীতারাম উত্তর করিলেন—"পেশকারকে দিয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছি।" চন্দ্রচূড় বলিলেন,—"বোধকরি আপনি ঠকের হাতে পড়িয়া থাকিবেন। যাই হক, সনন্দ দেখাইয়া এই গরমে গরমে, ভুঁইয়া সকল দখল করিয়া লইতে হইবে।" (সনন্দটি জাল তাহাতে সন্দেহ নাই। পাছে ঠাকুরের এই জালিয়াতি ধরা পড়িয়া যায়, সেইজন্য তিনি, সনন্দের কথা একবার মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত দিয়াছেন। 'বঙ্গেশ্বর মুর্শিদকুলীখাঁর অভিমত না লইয়া, দিল্লীশ্বর সীতারামকে সনন্দ দিয়াছিলেন।' এমন কথা যাহারা লেখে, বলে বা বিশ্বাস করে তাহারা, রাজা, রাজ্য ও রাজবুদ্ধি সম্বন্ধে নিতান্ত মূর্খ। আবার সেই সনন্দপত্র বঙ্গপতির মার্ফতে না দিয়া, সীতারামের হাতে দিলেন, সীতারামও এমন জ্ঞানবান্ রাজা যে, সে পত্র হাতে হাতেই লইলেন। এরূপ কল্পনা দাস ও দস্যুবুদ্ধি লোকের মাথাতেই উদয় হওয়া সম্ভব। আবার দেখ, যদি ভুঁইয়া সকল নিজ ভুজবলেই দখল করিতে হইবে তবে, সনন্দের প্রয়োজন হইল কি জন্য? দস্যুরাজ সীতারাম, প্রজাদিগকে ধোকা দিয়া দখল লইবার জন্যই এই কাজ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই গরমে গরমে সেই কাজ করা হইয়াছিল। ইহা সম্রাটী কল্পনা অথবা পলিক্লীর গল্প (মৃণালিনী পড়) তাহা ভাবিয়া পাই না। যাহারা এইরূপ দাসবুদ্ধি লইয়া, রাজবুদ্ধি ফলাইবার মানসে, বীরজাতিকে কাপুরুষ এবং কাপুরুষদিগকে বীর করিয়া দেখাইতে যায়, তাহাদের রহস্যোদ্দীপক বুদ্ধি গ্রন্থের প্রতিছত্রেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। লোকে পড়িয়া হাসে, কিন্তু সে হাসেও না লজ্জাও পায় না। যদি সেই সনন্দ সত্য হইবে, তবে পরিশেষে যখন মুর্শিদকুলীখাঁ সীতারামকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে সবংশে শূলে চড়াইলেন, তখন তাঁহার সেই সনন্দ পত্র কোন কথা কহিল না কেন? নভেল ঠাকুরের এই সামান্য চাতুরীটুকু বুঝিবার ক্ষমতা যাহাদের মাথায় নাই, যাহারা তাঁহার এই মাকাল ফলকে কাবুলী আপেল বলিয়া খাইতেছেন, তাঁহারাই তো দেশোদ্ধার করিবেন? যাঁহাদের অন্তরে দেশহিতৈষণা আদৌ নাই, কেবল অর্থ ও যশের জন্য, দেশহিতৈষণার ভাণ অবলম্বন করিয়া, আকাশউচ্ছ্বাসী হুজুগ তুলিয়া দেশ এবং দশকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে দাঁড়ান, দুষ্য সাহিত্যের দিকে তাঁহাদের চোখ পড়িবে কেন? কারণ জন সাধারণের চোখ ফুটাইয়া দিলে, সকলেই যে তাঁহাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবে। সেই জন্য তাঁহারা দেশের মাথা সংশোধনের কথায় বধির কর্ণ

তবে তাঁহারা চাঁদা তুলিতে মস্ত ওস্তাদ।—কাঁদুনী গাহিয়া সাপের খেলা দেখাইতে অতুল খেলওয়াড় বটে।

সীতারামের দস্যুবুদ্ধিটা চিরকালই তাঁহার আত্মা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি চন্দ্রচূড়ের কথা সিদ্ধান্ত করিয়া সৈন্যবল দিয়া মৃন্ময়কে ভুঁইয়া সকল দখল করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মৃন্ময় সেই জাল সনন্দ পত্র দেখাইয়া, প্রজাগণকে বলিবা মাত্র, তাহারা সীতারামকে কর দিতে স্বীকৃত হইল। ভূষণায় যাইয়া তোরাব-খাঁকে সনন্দপত্র দেখাইতে, তিনি বলিলেন,—"এই ছাড়পত্র সম্বন্ধে আমার নিকট কোনই সংবাদ আসে নাই। যদি এ পত্র জাল না হয় তবে, মুর্শিদাবাদে যাইয়া, নবাব মুর্শিদকুলীখাঁয়ের স্বাক্ষর লইয়া আইস, আমি নির্ব্বিবাদে ভূষণার দখল ছাড়িয়া দিব।"

হিন্দুরাজ্যের প্রজাবর্গ আপনাদিগকে দেবাশ্রিত মনে করিয়া লইয়াছিল। নভেল ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "মুসলমানদের সহিত সম্প্রীতি হইলে, মুসলমান হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবে কে?" মৃণ্ময় সেই আনন্দে জন্তুপ্রায় হইয়া ভূষণায় আসিয়াছিলেন। তোরাবখাঁর কথা শুনিয়া, সেই আত্মায় চণ্ডালের রাগ উদয় হইল। "কি তুমি শাহীসনন্দ মান না?" এই বলিয়া সহসা তোরাবের মস্তক ছেদন করিলেন। (এইরূপ নিদ্রিত ব্যক্তির মস্তক ছেদনকরাকে নভেল ঠাকুর, তদীয় পাণ্ডিত্য বুদ্ধি মতে, যুদ্ধে-জয়-করা বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। কথাটা সম্পূর্ণ অলীক হইলেও, এবং অনৈতিহাসিক হইবার কারণে, এ ধরণের অলীক নভেল চলিতে না পারিলেও, তথাপিও এ স্থলে যদিই, আমরা এই কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, সে অবস্থাতেও, নভেল ঠাকুর নিদ্রিত তোরাবকে হত্যা কর্ত্তন করিয়া, 'যুদ্ধে জয় করিয়াছি' বলিতে পারেন না। ঠাকুর নিজে বাতুলবুদ্ধি ছিলেন এবং তাঁহার পাঠকদিগকেও বাতুলবুদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।—এই তুচ্ছ বুদ্ধি দূর করিবার চেষ্টা যাহাদের নাই, তাঁহারাই কি দেশোদ্ধার করিবেন?

ঠাকুর বলিতেছেন—"ভূষণা দখল হইল, যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িল (কি করিয়া তাহা বলেন নাই। পীরবক্স যে কিরূপে মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন তাহাও খুলিয়া বলেন নাই।) সে সকল ঐতিহাসিক কথা, কাজেই আমাদের (ন্যায় অলীক ভাষী, যাহারা ইতিহাসে কিছুমাত্র দখল রাখে না, যাহারা গাল-গল্পে নিজেরা নিজেদের প্রতারিত করে, তাহাদের) কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না।"
(ইতিহাসই যে রাজবুদ্ধির সোপান, ঠাকুর তাহা বুঝিতেন কি?)

"বাদশাহী সনন্দের বলে এবং নিজ বাহুবলে, সীতারাম দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, মহারাজ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক (ইনি 'মহা জমিদার' উপাধির উপযুক্ত কি না, পাঠক তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।) প্রচণ্ড প্রতাপে শাসন আরম্ভ করিলেন।" (যিনি শাহী সনন্দের বলে বার খানি মাত্র গ্রামের জমিদার, তাঁহার বাহুবল, আধিপত্য,এবং প্রচণ্ড প্রাতাপ যে কিসের তাহা সাধারণের বুঝিবার নহে। যাঁহারা সাতটি মাত্র সেপত্তুনে কল্পনার বলে সাহিত্য সম্রাট হয়, তাঁহাদের বুঝিবার বিষয় বটে। এখানে—'প্রচণ্ড জুয়াচুরির সহিত জাল সনন্দ হাসিল করিয়া;—প্রচণ্ড দাগাবাজির সহিত তোরাবকে বধ করিয়া, প্রচণ্ড দমবাজিতে দ্বাদশ ভুঁইয়ার দখল পাইয়া, সীতারাম প্রচণ্ড অত্যাচারের সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন' বলা উচিত ছিল।—ঠাকুর যেন এইরূপ বলিয়াছেন;—হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ী, চোর ভায়া প্রচণ্ড প্রতাপে পাথর কুচাইতে আরম্ভ করিলেন।)

১০ ❋ গঙ্গারাম দোষী। ❋ ১০

শাসন সম্বন্ধে আগেই গঙ্গারামের কথা উঠিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না।—পতিপ্রাণা অপরাধিনী (অপরাধিনী অথচ পতিপ্রাণা,এ বুঝি কবির রুচানুযায়ী শব্দ যোজনা?) রমাই সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে (সকপটে নহে কি?—অকপটে হইলে একা গঙ্গারাম হাজতে পচিবে কেন?) সীতারামের নিকট প্রকাশ করিল। বাকি যে টুকু সে টুকু মুরলা ও চাঁদশা ফকির সকলই প্রকাশ করিল।—কেবল গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করা বাকি।—সীতারাম অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন; সরলা রমা নিরপরাধিনী, অপরাধের মধ্যে—কেবল পুত্র স্নেহ। (তবে কি গঙ্গারাম বাজোরে সেই অপরাধ করিয়াছিল?—ইহাকে ঠাকুরী বিচার বলে।—যাহার চুরী যায়, সে কখনই চোর হইতে পারে না, যে চুরি করে সেই চোর। এখানে রমার সতীত্ব চুরি গিয়াছে, তাই সে চোর নয়, গঙ্গারাম চুরি করিয়াছে, সেই চোর। আমরা অনেক চিন্তার পর মীমাংসা করিয়া দেখিলাম,—মুসলমান মধ্যে যাহারা নিতান্ত মূর্খ ও পুরুষানুক্রমিক আহাম্মক এবং হিন্দু মধ্যে B. A, M. A. পাশকরা লোক, বুদ্ধি আদি কল্পনায় উভয়েই তুল্য। এবং মুসলমানদের মধ্যে সোনাভান জৈগুনাদির লেখকের ন্যায়, হিন্দুমধ্যে বঙ্কিন বাবুর ন্যায় লেখকেরা কল্পনাদি দূরদর্শিতায় তুল্য। হিন্দু লেখকদেরই গ্রন্থ পাঠে মুসলমানেরা হুক্কনী হইতেছে। হিন্দু

তাঁহারা যদি তাঁহাদের দুষ্ট গ্রন্থগুলি তুলিয়া না দেন, তবে মুসলমানেরা যেন উঁহাদের দুষ্টগ্রন্থ, স্কুল-কলেজে পড়িতেও আপত্তি করেন। এই সমালোচনা পাঠ করিলে বঙ্গ-সাহিত্য মধ্যে যত মন্দ গ্রন্থ আছে, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি নিশ্চয়ই পাইবেন।—নীচ মুসলমানেরা নীচ কল্পী হইবার কারণে, নীচ কল্পনা উচ্চ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে উচ্চ হিন্দুরা নীচকল্পী হইবার কারণে, নীচ কল্পনা হিন্দু সাধারণ মধ্যে অবাধে প্রচারিত হইতেছে। যেদিন নীচ কল্পনা উচ্চ মুসলমানদের মাথায় জাগিবে, সেদিন সমগ্র মুসলমানই নীচ ও বাতুল বুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইবে।)

"অন্তঃপুরের মধ্যে সিঁদ হইয়াছে কাজেই নন্দাও এ বিষয়ে দোষী, যেমন চোর না ধরিতে পারিলে পুলিষকেও অপরাধী হইতে হয়।—এ অবস্থায় নিজের রক্ষার জন্য পুলিষ প্রভুকেও তস্করসাপেক্ষ সাজিতে হয়।—তাই নন্দা রমার সাপেক্ষ হইলেন। গঙ্গারামের 'বাড়ীতে আসা' কথাটা গোপন করা যাইতে পারে না। (পারিলে গোপন করিতে ছাড়িত কি?) তবে রমা তাহাকে বিছানায় স্থান দিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রতীকার আবিষ্কার করা ভারি নয়। নন্দা রমার জন্য সীতারামকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'রমা নিরপরাধিনী, সে ছেলের জন্য গঙ্গারামকে বাড়ীতে ডাকিয়াছিল, সে তাহা এজলাসে বুঝাইয়া বলিলে সকলে তাহা প্রত্যয় করিবে, তাহাতে আপনি নিষ্কলঙ্ক হইবেন।'

সীতারাম বলিলেন,—"এজলাসে দাঁড় করান টা তো ভালকথা নয়। রমাকে আমার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আমি লোকের সাক্ষাতে আপনার মহিষীকে কুলটার ন্যায় খাড়া করিতে পারিব না।—তাতে আমার নাক কাটা যাইবে।"

নন্দা বলিলেন,—"শ্রী, হাটের মাঝখানে গাছে চড়িয়া চণ্ডীদেবীর সং দিয়া নাচিতে পারিল, আর রমার এজলাসে দাঁড়াইতে দোষ হইল?—যা হোক এক কাজ হইয়া গিয়াছে, আর হবে না। রমা আর গঙ্গারামের খেয়াল করিবে না। হিন্দুতে হিন্দুর অপবাদ লুকায়, আর আপনি স্বামী হইয়া স্ত্রীর অপবাদ লুকাইবেন না। যদি না লুকান তাতে কি আপনি নাক বাড়াইয়া গনেশ ঠাকুর হইবেন?"

অনেক বাদানুবাদের পর সীতারাম বুঝিতে পারিলেন যে, কোন গতিকে রমাকে নিরপরাধিনী সাবস্ত করাই উচিত। বলিলেন—"রমাকে ডাকিয়া আন, তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে; যাতে সে আসল কথাটা প্রকাশ না করে।"

রমাকে ডাকা হইল। রমা অতি সরল প্রকৃতির মেয়ে; যাহা করিবে মনে করিয়া এতদূর করিয়াছিলেন, দেবীদের কৃপায় সে মানস অন্য রকম হইয়া

গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার ধারণা—‘সত্য বলিলে নিশ্চয়ই সকলে তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন।’ সে সভায় যাইয়া সত্যই বলিবে। কিন্তু এখানে মিথ্যা বলাইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া দরকার বলিয়া ডাকা হইয়াছে। রমা আসিতেই সীতারাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি গঙ্গারামকে কেন বাড়ীতে ডাকিয়াছিলে?”

রমা বলিলেন,—“মুসলমানেরা পাছে নিশার গভীরে প্রাসাদে ঢুকিয়া আমার ছেলেকে মারিয়া ফেলে, সেই ভয়ে গঙ্গারামকে ডাকিয়াছিলাম।”

সীতারাম প্রশ্ন করিলেন,—“তাকে ডাকিয়া তুমি কি বলিলে?”

রমা। “বলিলাম এই ছেলের পিতা বাড়ী নাই, মুসলমানের ভয়ে আমার একা নিদ্রা আসে না। এই ছেলের পিতা যতদিন বাড়ী না আসে, তুমি এর পিতা হয়ে আমার নিকট থাক। নইলে আমার ঘুম হইবে না।”

সীতা।—ওরূপ বলিলে চলিবে না। তুমি এজলাসে দাঁড়াইয়া বলিবে—‘গঙ্গা-রামকে এই ছেলে রক্ষার ভার দিয়া বলিয়াছিলাম, বিপদের সময়, তুমি এই ছেলেকে পিতার মত রক্ষা করিবে বল! নইলে ছেলের চিন্তায় আমার ঘুম হইবে না।

রমা। “আমিও তো তাই বলিতেছি।—পাছে সে পিতার মত রক্ষা না করে তজ্জন্য আমি তাকে, ছেলের পিতার সকল সম্মান দিয়াছিলাম।”

সীতা। “আরে তা না হাবী, বলিবে যে, পাছে পিতার মত না দেখে, তজ্জন্য টাকা-পয়সায় তাহার সম্মান করিয়াছিলাম।”

রমা। “তাইতো বলিতেছি—কেবল কি অর্থ, আমি যে তাঁকে হৃদয়পদ্মের ভ্রমর করিয়া রাখিয়াছিলাম।”

সীতা। “তা নয়, বলিবে—আমি তাহাকে পদ্মমধুর সন্দেশ ভেট দিয়াছিলাম।” এই বলিয়া রমাকে শিক্ষা দিবার জন্য নন্দাকে নিযুক্ত করিলেন। নন্দা তাঁহাকে রাতদিন ধরিয়া শিখাইতে লাগিলেন।”

১১ ✱ গঙ্গারাম নির্দ্দোষ। ১১ ✱

নভেল-ঠাকুর বলিতেছেন,—“যথাসময়ে (মহারাজ নয় মহা ধোকাবাজ) সীতারাম রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। নকিব স্তুতিবাদ করিল; কিন্তু গীত-বাদ্য সেদিন নিষেধ ছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ গঙ্গারামকে সম্মুখে আনীত করা হইল; সভায় নগরের সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গঙ্গারামকে দেখিতেই গোলমাল

করিয়া উঠিলেন। শান্তিরক্ষকেরা তাহাদিগকে শান্ত করিল। রাজা গঙ্গারামকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—গঙ্গারাম, তুমি আমার কুটুম্ব, আত্মীয়, প্রজা এবং স্নেহের ভোগী। আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ এবং অনুগ্রহ করিতাম। তুমি বড় বিশ্বাসের পাত্র ছিলে, ইহা সকলেই জানে। একবার তোমার আমি প্রাণরক্ষাও করিয়াছিলাম। তারপর তুমি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে কেন? (ঠাকুর এখানে কেমন সুন্দর রূপে হিন্দু চরিত্র আঁকিয়াছেন। অর্থাৎ এ জাতির যতই উপকার করিবে, ইহারা ততই বিশ্বাসঘাতক হইবে। আর এমন কথাতে যখন কাহারও আপত্তি নাই, তখন ইহা সত্য নয় কি?) তুমি রাজদণ্ডে (এটা রাখাল দণ্ডে বলিলে সত্য হইত, তবে তাহাতে পাঠককে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য বিশেষ অসুবিধা হইত বটে।) দণ্ডিত না হইবে কেন, তাহার কারণ দর্শাও।"

গঙ্গারাম বিনীত ভাবে বলিলেন,—"কোন শত্রুতে শত্রুতা করিয়া আপনার কাছে আমার মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে। আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে প্রমাণ না পাইলে, আমার কোন দণ্ড করিবেন না।"

রাজার আদেশে চন্দ্রচূড় সাক্ষ্য দিল, এবং তাহাতে প্রমাণ হইল যে, শত্রুসেনের অনুগমন রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গারাম নিশ্চেষ্ট ছিল। গঙ্গারাম তাহার সাফাই দিল,—"শত্রু কোথায় গঙ্গার সে পারে, আমি যুদ্ধ কাহার সহিত করিব? এ পারে আসিলে দেখিতে, গঙ্গারাম একিরূপ লবণে প্রতিপালিত হইয়াছে।—(বলি ঠাকুর আপনি না বলিয়াছিলেন।—মৃণ্ময়ের অসাধারণ সাহস ও কৌশলে, মীরবক্স সসৈন্যে পরাজিত ও নিহত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে শয়ন করিল। মুসলমানেরা তো মোটেই গঙ্গার এপারে আসে নাই।—তাই বলি ঠাকুর, নভেল লিখিতেও মাথা চাই। মুসলমানেরা এ জাতিকে গোলাম বলিত কেন, সে কথা কেহ উদ্ভাবন করিতে পারেন কি? যাহারা অন্যপরকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেই উদ্‌ভ্রান্ত।—পাঠক আর এক তামাসা দেখুন, রমা একধরণে আর গঙ্গারাম অন্য ধরণে পাপ লুকাইবার চেষ্টা করে কেন? এতেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দুইজনেই পাপী।—পাঠক মহাশয়, কথাগুলি উত্তমরূপে বুঝিয়া পাঠ করিবেন।)

"এখন রাজা আদেশ করিতে, ডিটেকটিভ চাঁদশা যাহা বলিল, তাহাতে প্রমাণ পাইল যে, গঙ্গারাম গোপনে তোরাব খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছিল। গঙ্গারাম তাহাতে সাফাই দিল। 'আমি সে রাত্রি তোরাব খাঁর নিকট গিয়াছিলাম বটে। বিশ্বাসঘাতক সাজিয়া তাহাকে গড়ের নীচে আনিয়া টিপিয়া মারিব,—সে কাজে

আমার এই অভিপ্রায় ছিল।' রাজা বলিলেন,—"তোরাব খাঁর নিকট কিছু পুরস্কার চহিয়াছিলে কি?" গঙ্গারাম বলিল,—"তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কার চাহিয়াছিলাম।—আর কিছু না।"

"তখন চাঁদশা বলিয়া দিল যে, আর ছোট রাণীকে পুরস্কার চাহিয়া ছিল।' গঙ্গারাম সে কথা একেবারে অস্বীকার করিয়া বলিল। আমি ছোট রাণীকে কখনও দেখি নাই—কি জন্য তাহাকে কামনা করিব।"

"তার পর দ্বারবান এবং মুরলার কথায় প্রমাণ হইল যে, গঙ্গারাম নিয়ত রাত্রে ছোট রাণীর মহলে যাইত। গঙ্গারাম তাহাদের মিথ্যাবাদী বলিল। তখন সভার মধ্যে রমা সুন্দরীকে ডাকা হইল। তিনি বলিলেন,—"যখন রাজার ভৃত্য তখন গঙ্গারাম আমারও ভৃত্য। আমি যাহা আদেশ করিব রাজার ভৃত্য তাহা কেন পালন করিবে না? আমি রাজকার্য্যের জন্য কোতওয়ালকে ডাকিয়াছিলাম, তার আবার বিচার কি, আমি বলিবই বা কি?"

"রমার কথায় নগরের সকলেই বুঝিয়া গেল যে সে দোষী এবং সকলেই তাহাকে অসতী বলিতে লাগিল। চন্দ্রচূড় অনেকরূপে রমাকে জেরা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহাকে সাধারণের সম্মুখে সতী প্রমাণ করিতে পারিলেন না।" শেষে নভেল ঠাকুর রমাকে দিয়া কতকগুলি শপথ করাইয়া বলাইলেন যে, তিনি তাহার ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য গঙ্গারামকে ডাকিয়াছিলেন। তাই বলিলেই কি কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে? গভীর রাত্রে কে তাহার ছেলে রক্ষার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া থাকে?—গঙ্গারাম বুঝিতে পারিলেন—'এ আর কিছুই নহে, সীতাকে বজায় রাখিয়া কিরূপে রাবণকে বধ করিবে, তাহারই ফিকিরে আছে।' তিনি বলিলেন। "রমা অন্য কাহারও সংস্রবে অসতী হইয়া থাকিবেন, আমি কিন্তু অসৎ নহি।" বিষম বিভ্রাট - নভেল ঠাকুরের মাথা ঘুরিয়া গেল।—ঠাকুর মাথায় বরফ বসাইয়া ভাবিলেন, 'এ জাতিকে দেবী দেখাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি জয়ন্তীকে সভার মধ্যে আনিলেন। সেই দেবী আসিয়া গঙ্গারামের বক্ষে ত্রিশূল ধরিতেই গঙ্গারাম তখন রমার নির্দ্দোষত্ব আপনার মোহ, লোভ, ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতার চেষ্টা প্রভৃতি সমুদায় কথা সবিস্তারে কহিল। জয়ন্তী ঠাকুরের কেস প্রমাণ করাইয়া দিয়া, তথা হইতে খরপদে চলিয়া গেলেন। রাজা গঙ্গারামকে শূলে দিবার জন্য হাজতে তুলিয়া রাখিলেন।

(পাঠক মনে রাখিবেন জয়ন্তী শ্রীর সহচরী আর শ্রী গঙ্গারামের ভগ্নী, নগরের লোক জয়ন্তীকে যাই ভাবুন, জয়ন্তী দেবী ছিলেন না।—জয়ন্তী যে গঙ্গারামের মন্দ করিবেন, সে কথা আপনার বিশ্বাস হয় কি ?—জয়ন্তী এই সভাস্থলে গঙ্গারামকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দিয়া, আবার উহাকে উদ্ধার করিতে যত্নবান হন কেন ?—সাধে বলি,—এমন সম্রাটী কল্পনায় হাত দেওয়া আমাদের চন্দোপুরুষের ঝকমারি। আমরা এইরূপ বলি :—) জয়ন্তী এ সভায় আসেন নাই। চাঁদশা সাক্ষ্য দিবার পর গঙ্গারাম দোষ স্বীকার করিয়া বলিল। "হাঁ আমি তোরাবের নিকট গিয়াছিলাম, তাহাকে প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস দেওয়াইবার জন্য আমি তাহার নিকট হইতে অৰ্দ্ধেক রাজ্যসহ ছোট রাণীকে চাহিয়াছিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কুকুরের মত প্রতি রাত্রি রমার বাড়ী যাইতে কি না ?" (নভেল ঠাকুর এই তীব্র কুকুর শব্দটি বসাইয়া এ স্থলে এক ভয়ানক ভাবের প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিন্দু রাজবাটীর লীলাটি তিনি কুকুর কুকুরীর লীলা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।) গঙ্গারাম উত্তর করিল। "আমাকে ডাকিত আমি যাইতাম, ডাকবন্ধ হইল আমিও যাওয়া বন্ধ করিলাম।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কি অভিপ্রায়ে ছোটরাণীর সহিত ঐরূপ গোপনে সাক্ষাৎ করিতে ?" গঙ্গারাম বলিল। "তাহা আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে; তবে তাহা বলিয়া ফল কি ?—ইহা আপনাদের অনুমানে এবং বিচারে যাহা দাঁড়াইবে, তাহাই সত্য। সেই অনুমানের উপর দণ্ড দিতে চান দেবেন।"

রমা যখন বলিবেন,—'আমি আমার ছেলের জন্য এবং রাজকার্য্যের জন্য গঙ্গারামকে ডাকিতাম' সে কথা কাহারও বিশ্বাস হইল না। সকলেই বলিলেন,—'গভীর রাত্রে ছেলের জন্য ডাক! এমন কথা শুনিলেও পাপ হয়।' গঙ্গারাম চন্দ্রচূড়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "রাজকার্য্য কি, তাহা বুঝিলেন না! তোরাবের সহিত সেই প্রবঞ্চনাসূচক সাক্ষ, আমি রাণীর পরামর্শেই করিয়াছিলাম। শত্রুকে কৌশলের সহিত বিনষ্ট করিয়া, নগরবাসী ও স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য, ছোটরাণী আমাকে গোপনে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমাকে টাকাকড়ি দিতেন, আমার তোষামোদ করিতেন, পদ্মমধুর রসগোল্লা খাওয়াইতেন, তাই আমি তাঁহার ঐ কুপরামর্শে পড়িয়া এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তোরাবকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য ছোটরাণী পত্রদ্বারা তাহাকে জানাইয়াছিলেন যে, 'আমি গঙ্গারামের অনুগত দাসী।' এই আমাদের অপরাধ, এই আমাদের পাপ, এই পাপে আজ

আমরা জগত সম্মুখে লজ্জিত হইতেছি ”

সকলে এক কথায় বুঝিয়া গেলেন ; ‘দোষী কেহই নহে।’ গঙ্গারাম আবার সকলের প্রশংসার পাত্র হইলেন। রমাকেও কেহ মন্দ বলিল না। তথাপি রাজা গঙ্গারামকে খালাস না দিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন এবং সময়ান্তরে তাহাকে শূলে দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। লোকে তাহাতে রাজাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন।—কিন্তু রাজার কৌশল কেহ বুঝিতে পারিলেন না।—তিনি যে কৌশলে শাহি সনন্দ হাসিল করিয়াছিলেন, আর সেই জাল সনন্দের বলে যে সকল কৌশলে প্রজাবর্গকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া এবং তোরাবকে বধ করিয়া, রাজা হইয়াছেন ; ইহাও তাঁহর তাদৃশ এক মহা কৌশল। এই গভীর জ্ঞানোজ্জ্বল কৌশলের বলে তিনি শ্রী'কে পাইবেন ; সেই জন্য এই গঙ্গারামকে কয়েদ করিয়াছেন।

শ্রী যেখানেই থাকুক, গঙ্গারামকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে এই কৌশল-সম্পন্ন কলে আসিয়া পড়িতেই হইবে।—তিনি রমাকে ত্যাগ করিবেন এবং তৎস্থলে শ্রীকে গ্রহণ করিবেন, ইহাই তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত এবং আন্তরিক ইচ্ছা। আর রমার সম্বন্ধে রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, রমার পীড়া হইয়াছে। (নভেল ঠাকুর, এই কথাটিকে তাঁহার জোটিলোক্তির শেঁকুলবনে এরূপে লুকাইয়া রাখিয়াছেন যে, তাহা উদ্ধত করা গোলামগত জ্ঞানের কার্য্য নহে।) এখানে ঠাকুরের পুস্তকের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, সম্রাটী জটিলতার অবগতি লাভ করিবেন।

(আমরা দেখিতে পাই, নভেল ঠাকুর তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকেই হিন্দু কুল মহিলাদের জাতিকুল উত্তমরূপে মজাইয়া, কলঙ্কের কালিমায় কালামুখী সাজাইয়া, পাপের পঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ ডোবাইয়া, আবার তাহাকে কুলে তুলিবার জন্য, নানা স্থলে নানা প্রকার অদ্ভুত প্রকৃতির বাগাড়ম্বর, বিশ্বাস অযোগ্য বচনলীলা ও অসামঞ্জস্য কথার কাঁহুনী আরম্ভ করিয়া দেন। কথাগুলি কাটা কাটা, কাটা ফাটা, ছেঁড়া ছেঁড়া, প্রস্থিতে, রিফুতে, ডাবে, তালীতে একাকার হইলেও, তাহাতেই দুর্ব্বলবুদ্ধি পাঠকদলকে বালক-ভুলান করিয়া, কোন গতিকে সেই পাপিষ্ঠাদিগকে পবিত্রকুলে তুলিয়া দেন। তাহাতে সাধারণের কথা দূরে থাক, বঙ্কিমসাপেক্ষ সমালোচক গিরিজাবাবুও কবির কথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ—‘কেন তোমরা তোমাদের পুরোবাসিনীদের অসতী মনে কর ; কেন বল— ‘অমুক নারী অমুকের সহিত রাত্রিকালে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, অমুক নারী বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল ;—তুমি অমুক নারীর শয়নগৃহে একজন কাবুলীকে দেখিয়াছিলে, একটা

ফিরিঙ্গী অমুকের হাত ধরিয়া কি বলিতেছিল;—এইরূপ দেখিয়া তুমি যে সেই অবলার কলঙ্ক রটাইয়া দাও, ইহা তোমাদের ভ্রম এবং দুর্বুদ্ধি নহে কি? তোমাদের ঐ সকল ভ্রম কাটাইবার জন্যই নভেল ঠাকুর এই সকল উপমা দ্বারা চক্ষুদান করিয়াছেন। তোমরা জাননা যে, পাঁচজনের সঙ্গতে না বসিলে, তোমাদের পুরোবাসিনীদের চক্ষু ফুটিবে না, এবং তাহারা দেবী-চরিত্রা হইবে না। তোমরা পরম উদ্‌ভ্রান্ত তাই আপন কুলে আপনি কালি দিতে উদ্যত হও।"

গঙ্গারামের শূলী হইবার কথা শুনিয়া শ্রী জয়ন্তীকে বলিলেন। "এ কি হইল?" জয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন। "এইবার তার আইবড় নাম ঘুঁচাইব, নইলে তার কোপটা শেষে কি আমার ঘাড়ে পড়িবে?" শ্রী বলিলেন সে কিরূপ।" জয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন। "সে অপরূপ—আমি কি তোমাকে ছাড়িতে পারিব যে, সে অপরূপ কথা কহিব।—সে যে তোমার জন্য পাগল।" এই বলিয়া শ্রীর মুখচুম্বন করিয়া, জয়ন্তী তথা হইতে রাজ ভবনে গমন করিলেন। পুরোবাসিনীরা জয়ন্তীকে দেবী বলিয়া জানিতেন, তথায় তাঁহার সম্মানের অবধি রহিল না; স্বয়ং রাজাই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া চরণরেণু গ্রহণ করিলেন। দেবী তখন রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "আপনার অবিচার আরম্ভ হইয়াছে।—আমি আর আপনার নগরে তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।—গঙ্গারাম বিনা অপরাধে শূলে যায় কেন?—আর যদি সে যায়—তবে, রমার দণ্ড না হয় কেন?"

রাজা বলিলেন। "আমি গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিয়াছি উহারা দুইজনেই দোষী। রমাকেও দণ্ড দিব।—তবে আপনার বিনা পরামর্শে আমি কোন কার্য্যই করিব না।—রমার বিষয়ে আপনি আমাকে কি করিতে বলেন!"

জয়ন্তী বলিলেন। "যাহার গৃহে বিধবা কন্যা থাকে বা যিনি বহু রমণীর স্বামী। তাঁহাদের একটু স্বতন্ত্র নিয়মে থাকিতে হয়।—অনেক কথা দেখিয়াও দেখিতে নাই, শুনিয়াও শুনিতে নাই, জানিয়াও প্রকাশ করিতে নাই। বরং ফাটিয়া পড়িলে চাপা দিতে হয়। এই সকল বিষয়ে, (ইংরাজদের মত ইন্দ্রিয়-বীজয়ী না হইতে পারিলে, হিন্দুর হিন্দুয়ানী, কুল-গৌরব ও মানসম্ভ্রম থাকিবার নহে।—অনেক সময়ে অপরাধীকে কেবল মার্জ্জনা কেন, যৌথিক স্নেহ ও সময়ে সময়ে অর্থ দিয়াও সাহায্য করিতে হয়। সে কাজে দেবতারা সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন না।—যদি গঙ্গারাম এবং রমাকে একান্তই মার্জ্জনা করিতে না পারেন; তবে গঙ্গারামকে প্রকাশ্য ভাবে

এবং রমাকে গোপনে নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন ভদ্রলোকের কুলমান রক্ষা হইতে পারে না।"

সীতারাম। "আমিও তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। রমা 'পীড়িতা আছে' বলিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিয়া, তাহাকে নির্জ্জন আবাসে রাখিয়াছি। সে কিছু দিনের মধ্যে স্ত্রীরোগাক্রান্তা হইয়া মরিবে, সন্দেহ নাই।" জয়ন্তী স্তম্ভিতা হইয়া বলিলেন। "আপনি স্ত্রীহত্যা করিবেন না। তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন, আমি শ্মশান হইতে আপনাকে এক শবদেহ আনিয়া দিব। রমা মরিয়াছে বলিয়া সেই শবদেহের দাহ করিয়া, স্বীয় বিপুল কুলমান রক্ষা করুন।" সীতারাম তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন। "মা, আমার এক শেষ ভিক্ষা আপনার নিকট এই আছে—আপনি দয়া করিয়া আমার শ্রীকে আনিয়া দিবেন কি ?"

জয়ন্তী কিছুতেই শ্রীকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তথাপি তিনি কেবল কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে আনিয়া দিতে স্বীকৃতা হইলেন। এবং এইরূপে সকল কথার শেষ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

১২ ❋ নির্দ্দোষ গঙ্গার শূল। ❋ ১২

কয়েক দিনের পর জয়ন্তী আবার নগরে আসিয়া সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি এবার তাঁহার শ্রীকে বহু শিক্ষা দিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। শ্রী সেইরূপ যোগিনীর বেশেই আসিয়াছেন। সীতারামের মনে সন্দেহ হইল—'শ্রীই কি গঙ্গাতীরে আমার মস্তকে পদ রাখিয়াছিল—এঁকেই কি আমি মা বলিয়াছিলাম।' জয়ন্তী তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন। "আপনি ভাবিতেছেন কি।—এই দেবীই আপনার রাজলক্ষ্মী, ইনিই আপনার নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি এক সম্বন্ধে আপনার স্ত্রী, অন্য সম্বন্ধে আপনার 'মা'।—যেহেতু আপনি ইঁহাকে মায়ের তুল্য ভক্তি করিবেন, এবং স্ত্রীর তুল্য ভালবাসিবেন।"

সীতারাম শ্রীর গৌরিকরূপ ও মেঘোদ্ভাসিত বদনচন্দ্রমার দিকে অপলক নয়নে চাহিয়া বলিলেন। "আমার ঘরের দেবী ঘরে আসিয়াছে, আমি উহাকে প্রাণভরিয়া ভক্তি করিব। আমি শ্রীর শ্রীচরণে কোন বিষয়ে অবাধ্য হইব না।" জয়ন্তী সীতারামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রী সীতারামের সহধর্ম্মিনীরূপে রাজপ্রাসাদে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি

যোগিনী, যোগিনীরূপে পর্ণবাসে, রাজপ্রাসাদ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চাহিলেন। সেই পর্ণবাসে, রাজা ভিন্ন অন্য কেহ যাইতে পাইবেন না। রাজা যাইবেন সত্য, কিন্তু শ্রীর সহিত একাসন হইতে পাইবেন না।'—রাজা শ্রীর জন্য অতিশয় বিকলিত-চিত্ত হইয়াছিলেন। 'সময়ে সব হইবে, সময়ে শ্রী তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইবেন, সময়ে শ্রী, স্বামী চিনিতে পারিবেন; সময়ে প্রণয়ের সর্ব্ববিজয়ী আস্বাদন বুঝিতে পারিবেন, সময়ে স্বামীকে অকাতরে হৃদয় দান করিবেন।' এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীর ইচ্ছামত, তিনি তাঁহাকে 'চিত্তবিশ্রাম নামে' এক ক্ষুদ্র অথচ মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শ্রী তাহাতে বাঘছাল পাতিয়া বসিলেন। মহারাজা প্রত্যহ সেই চিত্তবিশ্রামে গমন করিতেন, স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া শ্রীর সহিত নিরস আলাপ করিয়া বিরস বদনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু সেই নিরস আলাপে তাঁহার চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট ছিল যে, দিন দিন তিনি তাহার নিকট, অধিক হইতে অধিকতর সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

জয়ন্তীর উপদেশ মত, গঙ্গারাম এবং রমাকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। গঙ্গারামকে দিনমানে প্রকাশ্য ভাবে অপমান করিয়া তাড়ান হইল। রমাকে অতি বিরলে এবং নগরবাসীর অজ্ঞাতে বিতাড়িত করা হইল; এবং তাহারই পরপ্রভাতে, জয়ন্তী প্রভৃতি শবদেহের দাহ করিয়া দিয়া, সাধারণকে জানান হইল যে, রমার মৃত্যু হইয়াছে। জয়ন্তীর ইঙ্গিতে গঙ্গারাম সেই বিতাড়িতা রমাকে পথ হইতে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া, উভয়ে এক যোগে দেশত্যাগী হইয়া মুর্শিদাবাদ চলিয়া যান। সেখানে যাইয়া মুর্শিদকুলীখাঁর, একজন সৈন্যরূপে নিযুক্ত হইয়া, প্রাণের রমাকে প্রাণে পাইয়া পরমানন্দে বাস করিতে থাকেন।—জয়ন্তী মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদ যাইয়া, রমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। (কেন যাইতেন পাঠক তাহা পরে জানিতে পারিবেন।)

একদিন গঙ্গারাম, মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট বসিয়া, সীতারাম সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।—'সীতারাম দস্যুবৃত্তি দ্বারা কতক সম্পত্তি করিয়াছিলেন, তিনি শাহী সনন্দ পাইয়া তাহা প্রজাবর্গকে দেখাইয়া এবং ফৌজদার তোরাবকে প্রাণে বধ করিয়া ভূষণা আদি দ্বাদশ গ্রাম অধিকার করিয়াছেন। আমি তাঁহার সেনাপতি হইয়াও তোরাব-সাপেক্ষ ছিলাম, তাই সীতারাম আমাকে সস্ত্রীক নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।'

নবাব এইরূপ শুনিয়া এবং গঙ্গারামের বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া, তিনি

তাঁহাকে পাঁচশত সেনার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং সনন্দ সম্বন্ধে বাদশাহের নিকট পত্র পাঠাইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, শাহী-কাসেদ নবাবের নিকট আসিয়া, শাহীপত্র প্রদান করিল। পত্রে লেখাছিল—"সীতারাম নামক কোন ব্যক্তিকে আমি সনন্দ দিই নাই, সে নিশ্চয় জালপত্র দেখাইয়া প্রজাবর্গকে প্রতারিত করিয়াছে। সীতারামের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে শূলে চড়াইতে ভুলিবেন না।"

কাসেদ কথায় কথায় আরও বলিল। "সীতারাম এক রূপবতী রমণীকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গমন করিয়াছিল। সে তথায় পৌছিতেই এক চতুর জুয়াচোর তাহার সেই উপঢৌকন অপহরণ করিবার মানসে, সে আপনাকে রাজবাটীর পেশকার বলিয়া সীতারামের নিকট পরিচয় দেয়; সীতারাম অমনি তাহার পায়ে উপড় হইয়া পড়ে। সেই দুষ্ট, সীতারামের নিকট হইতে দেড়লক্ষ টাকা ঘুস এবং মায় অলঙ্কার সেই রমণীকে গ্রহণ করিয়া, এক জাল সনন্দপত্র আনিয়া সীতারামের হাতে দিয়া বলে যে, 'তুমি দ্বাদশ ভৌমিকের মহারাজাধিরাজ হইলে। তুমি যাও ভুঁইয়া সকল বাহুবলে দখল করিয়া লওগে।—পাছে বাদশাহ তোমাকে নির্ব্বল মনে করেন, তজ্জন্য দখল সম্বন্ধে বেশিকিছু বলিলাম না।' এক্ষণে সেই জাল পেশকারও ধরা পড়িয়াছে। সে মুক্তকণ্ঠে এই সকল কথা স্বীকার করায়, পাতশাহ তাহার প্রতি এইরূপ আদেশ করেন।—'দস্যুপতি সীতারামের রমণী এবং ধন অপহরণ করা অন্যায় হয় নাই, তবে শাহীসনন্দ দিয়াছ বলিয়া তোমাকে একবৎসরের জন্য কারাগৃহে বাস করিতে হইবে।" জয়ন্তী এই সকল কথারই সংবাদ, সেখানে যাইয়া লইতেন।

"সুশ্রী শ্রীমতী শ্রীবিলাসী সীতারাম প্রথম প্রথম সায়াহ্নকালে চিত্ত-বিশ্রামে আসিতেন, প্রহরেক কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইতেন। তার পর ক্রমশঃ রাত বেশি হইতে লাগিল। পৃথক আসনে বসিয়াও তিনি শ্রীর আলাপে সুখশান্তি উপভোগ করিতেন। ক্ষুধা এবং নিদ্রায় পীড়িত না হইলে, সে স্থল ত্যাগ করিতেন না। কিছুদিন পর তিনি, চিত্তবিশ্রামেই আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে আহার এবং শয়ন পৃথক কক্ষে হইত। শ্রীর বাঘছালের নিকট ঘেঁসিতে পারিতেন না।—এমন করিয়াও সীতারামের মানস সফল হইল না।" (ঠাকুরের এই উপদেশটি বেশ চমৎকার—যদি কোন ব্যক্তির কন্যাকে তাহার জামাতা গ্রহণ না করে, তবে সেই কন্যাকে কতক দিন সন্ন্যাসী সাজাইয়া ভ্রমণ করাইয়া এবং এক হাটের মাঝে গাছের উপর নাচাইয়া লইলেই, জামাইব্যাটা তাহার গোলাম হইয়া যাইবে।)

১৩ * জয়ন্তী পুরুষ নয় কি ? * ১৩

"এইরূপ একবৎসর কাল, রাজকাজ ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও, সীতারাম শ্রীর প্রেম পাইল না।" এখানেই শ্রীর সতীত্বের উপর আমাদের সন্দেহ জন্মায় না কি ?) সীতারাম শ্রীর প্রতি কিছু সন্দেহ করিলেন। বিশেষ করিয়া জয়ন্তী শ্রীকে প্রত্যহ গভীর নিশায় দেখিতে আসে কেন ?—শ্রী যখন জয়ন্তীর সহিত আলাপ করে, তখন সীতারামকে তথায় থাকিতে দেন না কেন ?—তবে জয়ন্তী যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে, কথাটা গুরুতর হইত। এইরূপে কতকদিন কাটিয়া গেল। এক রাত্রি সহসা সীতারাম, শ্রীর কক্ষদ্বারের সন্ধিস্থলে চক্ষু রাখিয়া দেখিলেন, শ্রী জয়ন্তীকে বক্ষে লইয়া মুখামুখী হইয়া শয়ন করিয়া আছে। দেখিতেই ভাবিলেন উহা দেবীদের লীলা। আর যখন দুইজনই স্ত্রীলোক তখন ঐরূপ আলাপেই দোষ কি ?—পরক্ষণে ভাবিলেন, 'শ্রী তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী নহেন কেন ?—যে শ্রী রমণীকে হৃদয়ে রাখিয়া, হৃদয়ে শান্তিদান করিতে লালায়িতা—সেই শ্রী আপন স্বামীকে একাশন হইতে দেয় না কেন ?' সে কথা ভাবিতে গেলে, সীতারামের মনে কিছু সন্দেহ হয়।—ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ কিছু উদাসীন মনা হইলেন।—চিন্তা করিতে করিতে আনমনে নগরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।—শূন্যমনে ভ্রমণ করিতে করিতে, মধুমতীর প্রস্তর সোপানে আসিলেন। দিল্লী হইতে আসিয়া যে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন ; সেই খানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।—চিন্তা করিতে করিতে, সেই দিনের দৃশ্যাবলী তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। তিনি চিন্তার নয়নে দেখিতে পাইলেন, যেন শ্রী ও জয়ন্তী জলকেলী করিয়া, দুইজনে মুখামুখী হইয়া সোপানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জলসিক্ত বসন ত্যাগ করিতেছেন।—সীতারাম তাঁহার সেই চিন্তানিদ্রিত নয়নে স্পষ্ট দেখিলেন—**জয়ন্তী পুরুষ।**

তখনি তাঁহার সেই চিন্তার তন্দ্রা কাটিয়া গেল, অমনি ভাবিলেন। 'তাও কি সম্ভবে,—জয়ন্তী দেবী-প্রতিমা ! আমার নগরলক্ষ্মী, আমি নিতান্ত পাপী, তাই আমার পাপমনে পাপকথা উঠিতেছে।' এইরূপ কতক্ষণ ধরিয়া তিনি আপনাকে আপনি তিরস্কার করিয়া, শেষে ভাবিলেন।—এই ঘাটে সেই দেবীদ্বয় স্নান করিয়াছিলেন — আমি এই ঘাটে স্নান করিব, আমার অন্তরের ভ্রমরাশি কাটিয়া যাইবে।—ভাবিতে ভাবিতে তিনি জলে নামিলেন। ভাটার সময়, একগলা জলে নামিতেই তাঁহার পদমূলে এক লৌহ-শিবক স্পর্শিত হইল। শিবকের শিরোভাগে এক লৌহবালা,

বালার মধ্যভাগে এক লৌহচক্র, চক্রটি কপিকলের চক্রাকার। একটি রজ্জু গঙ্গাবক্ষ হইতে আসিয়া সেই চক্র বেড়িয়া আবার তাহা জলের তলদেশ দিয়া গঙ্গাগর্ভে চলিয়া গিয়াছে।—আবার তাঁহার চিন্তা দেখা দিল, আবার তিনি চিন্তার নয়নে স্পষ্ট দেখিলেন—**জয়ন্তী পুরুষ**।

তিনি সেই-রজ্জুদ্বয়ের একটি ধরিয়া টানিলেন, তাহা কিছুতেই আসিল না। বোধ হইল যেন তাহা, কোথা গঙ্গার মধ্যস্থলে বাঁধা আছে। তখন তিনি অপরগাছি ধরিয়া টানিলেন, অমনি গঙ্গাগর্ভে, সেই যমজ-কুসুম ভাসিয়া উঠিল, তিনি রজ্জু টানিতে লাগিলেন, কুসুমদ্বয় ঘাটে আসিল।—সেই দুইগাছি দড়ির একটি যায় একটি আসে।—গঙ্গার মধ্যভাগে যে চর আছে, এ দড়ির অপর প্রান্ত সেই খানে।—তখন সীতারাম ভাবিলেন;—"আমরা কি অদ্ভুত লাঙ্গুলবিহীন জন্তু!—এই সামান্য কথাটা, কোটি কোটি দর্শকের মধ্যে কেহই বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই দেবী মনে করিয়া, পাপিনীদের পদে গড়াগড়া পড়িয়া গেলাম!—পাম জয়ন্তী তোমাকে সভার মধ্যে উলঙ্গ করিয়া সকলের নয়নের ভ্রম দূর করিব।" (আমরা বলি—সীতারাম, তুমি কিছুতেই উহাদের ভ্রান্তি দূর করিতে পারিবে না, ফলে তুমি উহাদের সেইরূপ প্রকোপে পড়িবে; সমালোচনা করিতে বসিয়া যেমন আমরা পড়িয়াছি। পীরসন্ন দেখিতেই বলিয়াছিলেন উহারা ডাকিনী।)

টিন নির্ম্মিত রংকরা ফুলদ্বয় নিকটে আসিলে, সীতারাম উহার উপর চড়িয়া কলবল দেখিয়া লইয়া, আবার সে পুষ্প যেখানকার সেখানে করিয়া জলে ডুবাইয়া, সেই ঘাটে এক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

১৪ ❋ জয়ন্তীর প্রতি বেত্রাদেশ। ❋ ১৪

এইরূপে সকল কথার অবগতি লাভ করিয়া, তিনি তৎক্ষনাৎ তথা হইতে চিত্তবিশ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। 'রামের আগে রামায়ণ' জয়ন্তী এ দিকে আগে হইতেই শ্রীকে চিত্তমন্দির হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। শ্রী জয়ন্তীর বেশ ধারণ করিয়া চিত্তমন্দিরে বসিয়া আছেন। তিনিও পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তোরণ-রক্ষীরা তাঁহাকে শ্রী মনে করিয়া ছাড়ে নাই। সীতারাম আসিয়া শ্রীকে দেখিতে না পাইয়া, জয়ন্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; তাহাতে নগর বাসীরা কাঁপিয়া উঠিল—'রাজা ক্ষেপিয়াছে, দেবীদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ

করিয়াছে, এইবার এই হিন্দুরাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে। (সর্ব্বনাশ হইবে তাহা সত্য, সীতারামের দোষে অথবা দাসবুদ্ধি গত উদ্‌ভ্রান্ত প্রজাদের দোষে, সে কথার মীমাংসা করিবার লোক সে রাজ্যে আছে কি ?) রাজা দিনস্থির করিয়া কহিলেন ;— 'এই দেবী ভয়ানক কপটি, ইহাকে উলঙ্গ করিয়া সভার মধ্যস্থলে বেত্রাঘাত করা হইবে।' দেবী শুনিয়া কোনরূপ ভয়ত্রস্ত হইলেন না। নগরবাসীরা দেবীর জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। (দেবীকে সভার মধ্যে মঞ্চের উপর খাড়া করাইয়া, তাঁহার উলঙ্গ অবস্থায় বেত্রাঘাত করা হইবে। এই ভয়ঙ্কর আদেশের কোন উপযুক্ত কারণ নভেল ঠাকুর দেখাইয়াছেন কি ?—তিনি শ্রীর সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য এই ভয়ানক কথার কারণ জানিয়াও আমাদিগকে দেখান নাই। শ্রী যে সতী ছিল না, তাহা তিনিই শ্রীচরিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বসন্ত ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন।— বলিতে গেলে জয়ন্তীর অপরাধ নাই—তিনি, শ্রীকে আনিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকে লইয়া গিয়াছেন, রাজা পারেন শ্রীর অনুসন্ধান করিয়া লউন।

কথাটা চতুর্দ্দিক রাষ্ট্র হইয়া গেল। নির্দ্ধারিত দিনে, দেশদেশান্তর হইতে দলেদলে দর্শক আসিয়া মহাম্মদপুরের বিরাট মাঠে সমবেত হইতে লাগিল। এই সভায় আসিতে কাহারই নিষেধ ছিল না।—হিন্দু মুসলমান, দরিদ্র ধনী, মুর্খ পণ্ডিত, ইতর মেথর, ডোম চামার, ভদ্র অভদ্র, চারিদিক হইতে লোকের আমদানী হইল। সেই নরসমুদ্রের মধ্যস্থলে জয়ন্তী দেবীকে এরূপে এক মঞ্চের উপর খাড়া করা হইল, যেন তাহার উলঙ্গ-অবস্থা প্রত্যেক দর্শকই দেখিতে পায়। জল্লাদ বেত হাতে করিয়া জয়ন্তীর সম্মুখে দাঁড়াইল।—ব্যাপার অত্যন্ত ভয়ানক হইলেও দেবী একেবারে ভয়শূন্য, সহাস্য-রসনা, প্রখর-নয়না, এবং গম্ভীর-বদনা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।—তাঁহার ভাবভঙ্গীতে নগরবাসী উত্রাসযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সভার সকলেই দেবীর সেই ভয়াবহ গভীর উৎক্রোশবিকাশী বদন মণ্ডল দেখিয়া, বিষম অমঙ্গল গণিতে লাগিল। তাহাদের চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই দেবীকে বিবস্ত্রা করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই, সমগ্র অম্বর ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং এই পাপ পরিব্যাপ্ত নগরটীকে এক বিরাট গোরে পরিণত করিবে। কিংবা অনুরূপ বিপ্লবে, নগরবাসীকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিবে।—সীতারাম ভাবিতেছেন। 'এই অনন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হিন্দুরাজ্যের-প্রজাদলকে, আজ আমি এমন এক অপরূপ চক্ষুদান করিব যে, উহারা আর কখনও কপটীদের মায়ায় মুগ্ধ হইবে না, এবং আজ হইতে উহারা আমাকে একজন মহিমাময় দেবতা মনে করিয়া লইবে।'

দেবীর পক্ষ হইতে নগরের নরনারী একযোগে মিলিত হইয়া, রাজপদে বিনয়বাক্যে নিবেদন করিলেন; চন্দ্রচূড় ঠাকুর রাজার নিকট ভিক্ষারূপে, জয়ন্তীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মিনতি করিলেন।—(নভেল ঠাকুর বলিতেছেন।—

"রাজা ব্যাঙ্গের সহিত বলিলেন। "কেন,—দেবতার এমন সাধ্য নাই যে, আপনি ছাড়িয়া যায়? বেটী দুরাচারের উচিত শাসন হইতেছে।—(উহার উলঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলেই তোমাদের যাবতীয় ভ্রম এবং ভক্তি কাটিয়া যাইবে।)" তখন সকলে শেষ অনুরোধ এই করিলেন। "জয়ন্তী, দেবী না হইলেও স্ত্রীলোক তো বটে,—উহাকে বিবস্ত্রা না করিয়া বেত্রাঘাত করা হউক।" রাজা তাহাও শুনিলেন না। (পাঠক, রাজা জয়ন্তীকে 'বে-আবরু' করিবার জন্য এতদূর স্থিরপ্রতিজ্ঞ কেন?—এতে অবশ্যই কোন গুরুতর রহস্য নাই কি?")

ঠাকুর বলিতেছেন।—"জয়ন্তী তখন অপরিসীম ম্লানমুখে, জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্রা হইব! তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া, ক্ষণকালের জন্য চক্ষু আবৃত করুক। * * * ঐরূপে রাজাকেও নয়ন বন্ধ করিতে বলিলেন।"

"তখন মহা ক্রোধের অন্ধকারে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন,—কসাইকে বলিলেন 'জবরদস্তি সে কাপড়া উতার লেও' এবং সভার সকলকে বলিলেন। "যে কেহ নয়ন বন্ধ করিবে তাহার প্রাণদণ্ড করা হইবে।" (রাজা এখানে মুসলমানী ভাষায় হুকুম করিলেন কেন? একেই বলে দাসবুদ্ধি। ইহা দাসের মুখে আপনিই প্রকাশ পায়।)

(তখন চতুরা জয়ন্তী ঊর্দ্ধনয়না হইয়া ঈশ্বরসমীপে আরাধনা করিলেন।—'হে, দেবতাদের দেবতা মহাদেবতা যদি আপনার নিকট কখন কোন পুণ্য করিয়া থাকি, তবে আমার সেই পুণ্যবলে, আজ আমাকে রমণী হইতে পুরুষে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, আমার মান-ইজ্জত রক্ষাকর! আর এই নির্দ্দয় চণ্ডালরূপ, বন্যজন্তু-নিন্দ রাজাকে আমার নরাঙ্গ দেখাইয়া, উহার কুৎসিত অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দাও!" এই বলিয়া জয়ন্তীদেবী, তাঁহার বস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং সেই উচ্চ মঞ্চের উপর 'পন পন' করিয়া কতিপয় পাক ঘুরিয়া আবার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলিলেন;—"কে বেত্রাঘাত করিবে আইস!" সকলেই অবাক, উদ্‌ভ্রান্ত এবং বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাদেবী জয়ন্তী পুরুষাঙ্গে পরিশোভিত।) ঠাকুর বলিতেছেন, নন্দা আসিয়া জয়ন্তীকে

তাঁহার পুস্তক সমূহে, এইরূপ অন্তবিহীন উপকল্পনা, অনেক স্থলে করিয়াছেন।—তাই বলি,—যদি নন্দা আসিয়া জয়ন্তীকে লইয়া যাইবে, আর সমস্ত কথা অর্দ্ধপথে আসিয়া ধুয়াঁ হইয়া মিলিয়া যাইবে তবে, তেমন কল্পনা এত আড়ম্বরের সহিত পাড়িবার প্রয়োজন কি?—'জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত' এ কথাটা কেন এই নভেলে লিখিত হইল—না লিখিলেই বা হানি কি হইত?—এতে আসল কথাটা এই—ঠাকুর এই কল্পনাটি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিলেই শ্রী অসতী হইয়া দাঁড়াইবে; এবং সেই বীরবুদ্ধি হিন্দুরা একেবারে ভ্রান্তবুদ্ধি উড়েপ্রায় প্রমাণ হইয়া পড়িবে।—জয়ন্তীকে মঞ্চে খাড়া করিবার পর, তখন তাঁহার সম্রাটী নয়নে সে কথা প্রকাশ পাইল, তিনি অমনি সর্ব্বনাশ গণিয়া তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করিয়া জয়ন্তীরূপ চোরা ব'মালকে মঞ্চ হইতে সরাইরা দিলেন। (হিন্দু রাজ্য গঠন করিবার জন্য নভেল ঠাকুর আমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, আমরা সে সমুদয়ের পরিচয়, এই স্বদেশী আন্দোলনের বর্ণে বর্ণে দেখিতেছি। সুরেন্দ্রবাবুকে রাজা করিয়া তাঁহাকে সীতারামের তুলনায় শতগুণ সম্মান দান করিতে ভুলি নাই, আবার পরক্ষণেই তাঁহাকে শতগুণ অপমানে অপমানিত করিতেও ছাড়ি নাই। তাই বার বার বলিতেছি—'ডাইনে চোষা ছেলেগুলি বঙ্কিমচোষা মাথা, এদের নিয়ে কোন কাজে দাঁড়াও'না কোথা।'

জয়ন্তী বস্ত্র পরিধান করিলে, সভাস্থ সকলে তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। জল্লাদ বেত্রঘাত করিবে কি, তাহার হাতে সে বেত্র নাই। কে সেই বেত্র লইয়া, নরপিশাচ সীতারামের পৃষ্ঠে ঝড়াকারে বর্ষণ করিতেছে। তখন, অকাশ সম্ভব এক দল দেবতা, কখন আবির্ভূত হইয়া সীতারামের সেনা সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার পুরোবাসিনীদিগকে, ফুলমালা রূপে গ্রথিত করিয়া লইয়াছেন, এবং যমদূতের ন্যায় নিষ্কোষিত অসিহস্তে, রাজার সহিত সকলকে বন্ধন করিয়া ছাগদলবৎ, দলে দলে, পালে পালে, নগর হইতে তাড়াইয়া মাঠপানে লইয়া যাইতেছেন।—কোথা কোন্ শ্মশানভূমি কিংবা কোন্ নদীগর্ভ বোঝাই করিতে চলিয়াছেন, নিরীহ নগরবাসীরা সে দিকে চাহিয়াও দেখিল না। বরং তাহাতে তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। "বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।—দেবীর সঙ্গে এতদূর ধৃষ্টতা!" কেহ বলিল। "আমি পুর্ব্বেই বলি নাই—মানবের রূপ ধারণ করিয়া এই সভায় অনেক দেবতা আবির্ভূত হইয়াছে।"

কেহ বলিল;—আমি দেখিয়াছি, ঐ গাছটার পাতায় পাতায় এই দেবতাগণ বসিয়াছিলেন।” আবার এই কথা অনেকেই অনুমোদন করিলেন।

এই সময় কোথা হইতে শ্রী আসিয়া জয়ন্তীর বামপার্শ্বে পরিশোভিতা হইল। জয়ন্তী বলিলেন। “শ্রী, তুমি এইবার আমার সংশ্রব ছাড়, আমি এখন পুরুষ।” শ্রী বলিলেন। “দেবতারা যদি আপনাকে পুরুষ করিয়া থাকেন, তবে আমার জন্যই করিয়াছেন।” এই বলিয়া, যুগলমূর্ত্তি এক হইয়া, উভয়েই সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইলেন। অমনি নগরবাসীরা সোল্লাসে হুলাহুলি দিতে লাগিলেন। এবং সেই সময়েই জয়ন্তীর সহিত শ্রীর বিবাহ হইয়া গেল।—দেবতারা বন্দী সীতারামকে দেবমন্দিরে দাঁড় করাইয়া সেই বিবাহ দেখাইলেন। সীতারাম অশ্রুবিগলিত নেত্রে সেই ভীষণ হৃদ্যোদ্বেলক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে গঙ্গারাম, রমার হাত ধরিয়া, মঞ্চের নিকট আসিয়া যুগল দেবতাকে প্রণাম করিলেন। মৃত-রমাকে জিবীতাবস্থায় দেখিয়া, নগরবাসীরা, স্তিমিত নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এবং সকলে এক যোগ হইয়া, ভয়াবহ চিত্তে জয়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। “মা, ইনি কি আমাদের ছোট রাণীর প্রেতাত্মা?—এ—কে—মা?”

তখন জয়ন্তী, গঙ্গারাম এবং রমাকে মঞ্চের উপর খাড়া করাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন। “রমা, তুমি আজ দেড়বৎসর মরিয়াছ।—তবে তুমি কে, কেন এখানে এই সভায় আসিয়াছ?”

রমা বলিলেন। “আমি শ্মশানেই থাকিতাম, অদ্য প্রভাতে গঙ্গারাম আমাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিয়াছে।—আমি কে তা আমিই জানি না।”

তখন গঙ্গারাম বলিলেন। “আমি নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া পল্লীতে গিয়া অবস্থিতি করিতে ছিলাম। অদ্য প্রভাতে স্বীয় শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি, আমি এক শ্মশানে রহিয়াছি, আমার সম্মুখে এক দেবতা বসিয়া আছেন। সেই দেবতার আদেশে, সেই শ্মশানের এক জ্বলিত শবের ভস্মাবশেষ, দুই হাতে তুলিয়া লইলাম; এবং তাঁহারই আদেশ পালন করিয়া, সেই ভস্মমুষ্টিকে বলিলাম ‘তুমি মানুষ হইয়া যাও! পলকের মধ্যে এক ঘুর্ণিত পবন আসিয়া, আমার হস্তস্থিত ভস্মমুষ্টি, উড়াইয়া লইয়া আমার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। কতক্ষণ ঘুরিলে, আমি সেই পবনমধ্যে রমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, সেই মূর্ত্তি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে স্থূলকায় ধারণ করিয়া, পূর্ণমূর্ত্তি হইলে, পবন তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশে চলিয়া গেল; দেবতাকেও

আর তথায় দেখিতে পাইলাম না। তখন রমা আমাকে স্বামী বলিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা ধরিল। আমি বলিলাম 'আমি তোমার স্বামী নহি, চল তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট পৌঁছিয়া দিই।' এই বলিয়া রমাকে এখানে আনিয়াছি।" সীতারাম মন্দির হইতে আরক্ত লোচনে চাহিয়া বলিলেন। "হাঁ রে পাপিষ্ঠ।"—অমনি দেবতা তাঁহার মুখে পাদুকা প্রহার করিয়া তাঁহাকে কথা কহিতে দিলেন না। সীতারাম মনের দুঃখে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। নগরবাসীরা তাঁহার রোদনে আনন্দানুভব করিলেন।

জয়ন্তী বলিলেন। "এস রমার সহিত তোমার বিবাহ হউক।" গঙ্গারাম বলিলেন। "প্রভুপত্নীকে বিবাহ করিতে পারি না।" জয়ন্তী বলিলেন। "রমা যখন দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন, তখন রমা আর সীতারামের পত্নী নহে।" এই বলিয়া তাঁহাদের করে করে বন্ধন করিয়া দিলেন। নগরবাসীরা অমনি হুলাহুলি দিলেন, গঙ্গারাম রমায় বিবাহ হইয়া গেল, সীতারাম তাহাও স্বচক্ষে দেখিলেন। এবং প্রাণের দাহ সহ্য করিতে না পারিয়া, যেমন হুহুঙ্কার ছাড়িলেন, অমনি তাঁহার মুখে পাদুকাঘাত পড়িল। জয়ন্তী তখন গঙ্গারামকে বলিলেন "তোমরাই হিন্দুজগতের দেবদৃশ মানব!—তোমরা হিন্দুর জন্য যথোচিত করিতে গিয়া পুণ্যস্থলে পাপের প্রতিফল ভোগ করিয়াছিলে, তাহাতেও তোমাদের দুঃখ হয় নাই। তোমাদের সেই পুণ্যরাশি, ঈশ্বরস্থানে জমাছিল, এত দিনে তাহার সুফল তোমাদের উপভোগে আসিয়াছে।—তোমরা এই মহা নগরের রাজারাণী হইয়া আনন্দে দিনপ্রাত করিতে থাক। আশীর্ব্বাদ করি, নবাব এ রাজ্যের ভার তোমাদের উপরই অর্পণ করিবেন। আর অভিশাপ দিই—যেন নবাব সেই দেবদ্রোহী পাপিষ্ঠ সীতারামকে সপরিবারে কতল করিয়া ফেলেন। আর নগরবাসীকে উপদেশ দিই—যেন তাঁহারা সীতারাম সদৃশ দুশ্চরিত্র মনুষ্যদিগের প্রতি ঘৃণার নিষ্ঠীবন বর্ষণ করিতে না ভুলেন এবং গঙ্গারাম সদৃশ দেবদুর্লভ মনস্বীকে সম্মানের পুষ্পে আবৃত করিয়া, হিন্দুগৌরব বর্দ্ধন করিতে বিস্মৃত না হন।"

সেই সময় এক পঞ্চ বৎসর-বয়স্ক দেবসন্তান তুল্য নিঃসহায় শিশু, 'মা, মা' শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইয়া, সভার চতুর্দ্দিকে আকুলিত চিত্তে ভ্রমণ করিতেছিল। রমার কর্ণে সেই হৃদয়-বিদারক স্বর পৌঁছিতে, তাঁহার বাৎসল্যস্নেহ পূর্ণবেগে উথলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিকলিত চিত্তে দৌড়িয়া গিয়া সেই সন্তানকে কোলে তুলিয়া দেখিলেন, সেটি তাহারই হারাধন।—দেখ

বৎসর পর মায়ের মুখ দেখিয়া, ছেলেটি আহ্লাদে কথা কহিতে পারিল না। জননী তাহার সুকোমল বদন-মণ্ডলে ভূয়ঃভূয়ঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, জয়ন্তী, শ্রী, রমা এবং গঙ্গারাম, সভাস্থল ত্যাগ করিয়া, প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগরবাসীরা অপার আনন্দে ভাসিয়া যাহার যে আবাসাভিমুখে চলিয়া গেলেন। যাইবার কালে সীতারামকে নিষ্ঠীবনে সাজাইতে কেহই ভুলিলেন না।

তখন সীতারাম, নগরবাসীদিগকে কতিপয় কথা বলিবার অনুমতি দেবতাদের নিকট হইতে লইয়া, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি করিয়া বলিতে লাগিলেন। "এতদিনে বুঝিলাম, তোদের মত উদ্‌ভ্রান্ত মানব ইহলোকে আর জন্মিবে না। তবে শোন—এই পাপিষ্ঠ জয়ন্তী, বিশ্রী ঐ শ্রীর, চিরকালের উপপতি, তাই শ্রী কিছুতেই আমার হইল না। ঐ দুষ্টার দুষ্টামীতে এই সোনার রাজ্য কাগজ-রাজ্যের ন্যায় অকালে গলিয়া গেল। তোরা চির উদ্‌ভ্রান্ত মানব, তাই ঐ কৌশলীর কৌশল সমূহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, দুষ্টাকে দেবতা মনে করিয়া লইয়াছিস্। আর মনে করিস না যে, দুষ্টমতি রমা তোদের ঐ পাপাত্মা দেবতার ক্ষমতায় পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে! ঐ পাপিষ্ঠাকে আমি তাড়াইয়া দিয়াছিলাম!—" নগরবাসীরা বলিল। "তোর পাপমুখে তুই ঐরূপই বলিবি।—দে ওর মুখে থুথু ফেলে দে" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। (পিপীলিকার পালক উঠিলে নিশ্চয় জানিও তাহার মৃত্যু অতি নিকট, আর এ জাতির তুচ্ছ কল্পনা বল বাঁধিলে নিশ্চয় জানিও ইহাদের বিপদ অতি নিকট।—এ কথা এই গ্রন্থই প্রমাণ করিয়া দিতেছে।)

কিছুদিনের মধ্যে নবাবের নিকট হইতে গঙ্গারামের নিকট পত্র আসিল। "গঙ্গারাম, মহাম্মদপুরের রাজ্যভার তোমার উপর অর্পিত হইল, তুমি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা রাজসরকারে করস্বরূপ প্রেরণ করিবে। সীতারামকে সপরিবারে কতল করা হইয়াছে, বাকি সকলকে সরকারে নিযুক্ত করা হইয়াছে।"

(নভেল ঠাকুর বলিতেছেন।—গঙ্গারাম ছদ্মবেশে নবাবের সেনা লইয়া মহাম্মদপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দুইদলে বিষম যুদ্ধ বাধে। (হিন্দু রাজ্যের যোদ্ধৃবর্গ যে কেমন বীর, তাহা আমরা যদি স্বচক্ষে না দেখিতাম, তাহা হইলে ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিতে পারিতাম।) সীতারাম মহা বীরত্বের সহিত সপরিবারে পলায়ন করিয়াছিলেন।—(তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পলায়ন করিতে মস্ত বীর।) আবার বলিয়াছেন, সীতারামকে সপরিবারে নবাব, শূলে দিয়াছিলেন।—(সাহী সনন্দ পাওয়া লোক, শূলে যায় কেন, সে কথা ভুলিয়াও মুখে আনেন নাই।—

আবার বলিয়াছেন সীতারাম সপরিবারে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়াছিলেন।— (যাহার নিকট শাহী সনন্দ সে মুর্শিদকুলীকে ভয় করিবে কেন ?—ঠাকুর তাঁহার পাঠকদের যেন পাটনায়ি ম্যাড়া মনে করিয়াছেন।)

ঠাকুরের এই সকল বৈতালিক কল্পনার সিকারসে সিক্ত করিয়া এ দেশের মস্তিষ্ক অসারকপ্রায় হইবার কারণে, এ মাথায় হিজিবিজী কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই উদয় হয় না। সেই জন্যই এ দেশ দিন দিন শ্মশানে পরিণত হইতে থাকিলেও, কোন চেষ্টাতেই কেহ কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না।—অবনতির কারণ বুঝিতে না পারিলে উন্নতি করা যায় না। মস্তিষ্ক-দোষে-বিদূষিত-বঙ্গবাসী, দেশের এই ঘোর অবনতির কারণ কখনই বুঝিতে পারে নাই। ভীষকেরা (নেতারা) যথার্থ রোগ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, প্লীহা রোগের ঔষধ দিয়া বসিতেছেন, তাহার ফলে বক্ষে [illegible] বসাইয়া সকলেই ক্ষতবক্ষ হইতেছে।—ভীষকেরা তাহাদের জগদ্ব্যাপী বক্তৃতার মধ্যে, মস্তিষ্ক রোগের ব্যাখ্যা এবং উহার উৎপত্তি হইবার কারণ সকল আদৌ বলেন না। তাঁহারা কি সীতারামের কাগজ-রাজ্যগত কর্ম্মচারীবর্গের মত উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী নহেন ? সংবাদপত্র সকল, স্বদেশের উন্নতিকামী হইয়া কত প্রকার কথাই না লেখেন, কিন্তু এই মহা বিষয়ে কাহাকেও কোন কথা বলিতে শুনি না কেন ? দেশের মস্তিষ্ক দোষ দূর করিবার জন্য যত্নবান নহেন কেন ? তাঁহারা কিরূপ বিদ্যাবুদ্ধি বহন করেন যে, বঙ্কিম বাবুর দক্র বিদুষী গ্রন্থ সকলের সমালোচনা করিয়া, দেশের মস্তিষ্ক দোষ দূর করিতে দাঁড়ান না ? ইহা কি তাহাদেরও মস্তিষ্ক দোষের পরিচায়ক নহে ?

ভারতের অতি প্রাচীনতম ইতিহাসের পাঠেও জানা যায় যে, ভারত সম্রাট মহারাজ রঘুর রাজত্ব সময়েও এই দুর্বুদ্ধি বাঙ্গালী, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, নিজেদের মহিমা দেখাইতে ছাড়েন নাই ; এবং অদ্যাবধি ভারতের উপর কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের মনঃমধ্যে সেইরূপ ভাবেই প্রবল আছে। ইহা কি বাঙ্গালীর স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক নহে ? বঙ্গদেশ যখন ভারতের অন্তর্গত তখন, ইহাদিগকে ভারতের সহিত একমত হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে কি ? যতদিন বঙ্গদেশ এইভাবে গঠিত না হইবে, ততদিন ইহাদের উন্নতি নাই।

জয়ন্তী কে ?—উৎপন্নবুদ্ধি জয়ন্তীর সত্যনাম রাখাল চন্দ্র রায়। তিনি বাল্যকাল হইতেই এক যাত্রার দলে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই যাত্রায় 'জয়ন্তী দেবী' নামক নাটকের অভিনয় দেখান হইত। রাখাল তাহাতে জয়ন্তী দেবী সাজিতেন। তাঁহার উজ্জ্বল রূপলীলা, রমণীমস্থন শরীর আদি গঠন সমূহ ও কুন্তল-[illegible] নয়ন-মোহন শোভা দেখিয়া, কেহই তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া স্থির করিতে

পারিত না। অনেকেই তাঁহার উপর প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িতেন। অভিনয় স্থলে তাঁহার কৌশল সম্পন্ন অভিনয়ের দর্শনে, দর্শকবৃন্দ এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহাকে লজ্জাদেবীর সম্মান দান করিতে কিছুতেই কুণ্ঠিত হইতেন না। অনেকেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের রমণী রঞ্জিত মহিলামহলে লইয়া যাইতেন। যাত্রাকর মহাশয়, রাখাল রায়ের গুণে বিমোহিত হইয়া, ঔষধের দ্বারা তাঁহাকে চির খোসা করিলেন এবং স্বীয় শিশু কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে আবাসে স্থান দিয়া রাখিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রাখাল রায় স্ত্রী ও শ্বশুর হারা হইয়া, নিজেই সে দলের দলপতি হইলেন।

অন্যদিকে শ্রীকে যখন তাঁহার শ্বশুর ও স্বামী গ্রহণ করিলেন না তখন তিনি গঙ্গারামের শূন্যাবাসেই বাস করিতে লাগিলেন। চিরকুমার গঙ্গারাম প্রতি রাত্রিই দস্যুতা করিতে যাইতেন, তাহাতে শ্রী নির্বিঘ্নে যাত্রা আদি রং তামাসা দেখিয়া বেড়াইবার সুযোগ পাইতেন। জয়ন্তী দেবীর পালা শুনিতে গিয়া, তিনি জয়ন্তীকেই মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন জয়ন্তী শ্রীর 'সই' সাজিয়া, তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শ্রী গাছে চড়িয়া নাচিবার পর, যখন তিনি সীতারামের তীব্র আকাঙ্খার স্রোতে পড়িয়া গেলেন, তখন সেই স্রোতের সহস্র যোজন তফাৎ থাকিবার মানসে, তিনি জয়ন্তীকে লইয়া দেশান্তরী হইলেন। এবং সীতারামের সর্ব্বনাশের এবং গঙ্গারামের মঙ্গলের জন্য, তাঁহারা এক মনপ্রাণে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া বমজ পুষ্পযান নির্ম্মাণ করাইয়া, সেই পুষ্পের উপর আরোহণ করিবার কৌশল সকল উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার পর, তবে তাঁহারা মহাম্মদপুরে আসিলেন। মহাম্মদপুরে আসিয়া তাঁহারা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা জানেন। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, শ্রীই সীতারামের প্রাণ হন্ত্রী হইল কি না? দেখুন, সীতারামগ্রন্থের উদ্দেশ্য ও সামঞ্জস্য সকল রক্ষা পাইল কি না!

যাহাতে এই গোলামবুদ্ধি বঙ্গবাসীতে রাজবুদ্ধি, রাজকল্পনা, দূরদর্শীতার ক্ষমতা, জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ লিখিবার শক্তি, ও তুষ্য গ্রন্থের সমালোচনা করিবার জ্ঞান সকল প্রকাশ পাইতে পারে; এবং যাহাতে বঙ্গদেশ বীরবুদ্ধি হইয়া হুজুগ ত্যাগ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই সমালোচনা প্রকাশ করা হইল। কেহ যেন, হীন জ্ঞানের বশীভূত হইয়া বিপরীত মনে না করেন।